পিঞ্জরে বসিয়া ...

পিঞ্জরে বসিয়া...

সোম
নথ
ঘোষ

পিঞ্জরে বসিয়া...

করোনার আক্রমণে অন্তরীণ অবস্থায়
১ বৈশাখ ১৪২৭ থেকে ‘হরপ্পা’-র
বৈদ্যুতিন পুস্তিকা প্রকাশের সূচনা।
এই ক্রমে ৫ জুন ২০২০-র বিশ্ব পরিবেশ দিবসে
প্রকাশিত হল আমাদের চতুর্থ প্রয়াস
‘পিঞ্জরে বসিয়া’।

প্রচ্ছদ
সৌম্যদীপ

প্রচ্ছদের আলোকচিত্র
মেঘনা বসুমল্লিক

শিল্পনির্দেশনা
সোমনাথ ঘোষ

সম্পাদক
সৈকত

http://harappa.co.in/
harappamagazine@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/harappalikhanchitran/

৫ জুন ২০২০-র
বিশ্ব পরিবেশ দিবসে
বিশ্ব প্রকৃতিকে

পিঞ্জরে বসিয়া...

এই ‘লকডাউন’ সময়ে আমরা সকলেই একপ্রকার খাঁচায় বন্দি। আমাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পরিচিত মহিলারা প্রায় অধিকাংশই কর্মরত, ঘরে বা বাইরে। ছিদ্রান্বেষীরা হয়তো সকলকেই বলবেন নারীবাদী, সোচ্চার অথবা অনুচ্চার। যে-কথা আজ আর আলাদা করে বলার কিছু নেই, সেটি সাধারণ হয়ে গেছে শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে। পুরুষতান্ত্রিকতার খাঁচা সম্পর্কে তাঁদের কোনো দ্বিমত নেই বা থাকলেও সময়-সুযোগমতো বাস্তব জীবনে শব্দটি প্রয়োগে দ্বিধা করেন না। মাঝে-মাঝে হয়তো-বা রবি ঠাকুর-সত্যজিৎ মিলিত ঘরানায় ‘খাঁচার পাখি’ ধরনের কোনো শিল্পসম্মত ভাব নিজেদের সম্পর্কে পোষণ করেন। লকডাউন যেহেতু রাষ্ট্রীয় আরোপ, পরবর্তীকালে তা হয়তো পুরুষতান্ত্রিক অর্থাৎ অবিবেচক, নিপীড়ক তকমা পাবে। তা না-পেলেও লকডাউনের প্রভাব স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে শুরুর দিন থেকে যে পীড়ন শুরু করেছে এ নিয়ে সন্দেহ নেই। সেই ‘লকডাউন’-এর মধ্যে আমাদের সমাজের

নারীরা আলাদাভাবে তাঁদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে কী ভাবছেন জানতে ইচ্ছা হয়েছিল। আশেপাশের পরিচিতদের থেকে দূরভাষে টুকটাক আলোচনা কথাবার্তায় জানাও যাচ্ছিল কিছুটা। কিছু বিষাদ, কিছু ভালোলাগা, কিছু বিরক্তির কথা। যা থেকেই এই পুস্তিকার পরিকল্পনা। কিন্তু বৃহত্তর সমাজে লকডাউন-এর প্রেক্ষিতে নারীর মনোভাব একত্রিত করার মতো ক্ষমতা বা যোগ্যতা কোনোটাই আমাদের নেই, সেটা খুব পরিষ্কারভাবে বলে নেওয়া উচিত। যে কারণে এই সংকলনকে আদৌ 'নারীদের মনোভাব' তকমা দেওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যাঁরা মনোভাব প্রকাশ করেছেন তাঁরা সকলেই মধ্যবিত্ত বা উচ্চ-মধ্যবিত্ত সচ্ছল শিক্ষিত শ্রেণিভূক্ত। বাঙালি মধ্যবিত্তের স্বভাব-সম্পদ শিক্ষা-সংস্কৃতি তাঁদের করায়ত্ত। প্রত্যেকেই রুচিশীল, কিঞ্চিৎ শৌখিন, মোবাইল ফোনের দৌলতে সর্বদা সোশ্যাল মিডিয়ায় জাগরূক, ফোন ক্যামেরায় যখন-তখন ধরা পড়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য—পাখি, ফুল, আকাশ ইত্যাদি অনেক কিছুই। এঁদের মধ্যে এক চতুর্থাংশ হয়তো নিয়মিত লেখালিখি করেন, খুব মন দিয়ে ফটোগ্রাফিচর্চা করেন কয়েকজন। বাকিরা কয়েকজন অনিয়মিত ডায়েরি লেখার মতো (বর্তমানে ফেসবুক), কিছু ভালো লাগলে হাতের মোবাইলে ছবি তুলে শেয়ার করেন। সেই সব নিয়ে

স্মরণীয় বছর '২০২০'-র 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস'-এ এই সংকলন প্রকৃতিকে উৎসর্গীকৃত। একটু গভীরে গিয়ে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে হয়তো বোঝা যাবে বস্তুত একুশ শতাব্দীতে মধ্যবিত্ত গৃহের প্রকৃত শ্রেণি অবস্থানটিকে। নিজেদের চিনতেও হয়তো সাহায্য করবে এই সংকলন। বলা হয়েছিল লকডাউনের প্রেক্ষিতে বাইরে পাখিদের দেখে যা মনে হয়েছে, কেমন আছেন তাঁরা সেকথা স্বল্প পরিসরে লিখতে। যাঁরা নিয়মিত লেখিকা তাঁরা লিখেছেন তাদের মুন্সিয়ানা নিয়েই, যাঁরা সেভাবে প্রথাগত লেখালেখি করেন না, তাঁরা জানিয়েছেন তাঁদের অন্তরঙ্গ ভাষায়। পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন সে পার্থক্যটুকু। ছবি যিনি যেমন তুলেছেন তাঁর লেখায় সেগুলিই ব্যবহার করা হয়েছে, তাই আলাদা করে আলোকচিত্রীর নাম দেওয়া হয়নি, নেই ক্যাপশানও। কয়েকজন লকডাউনের সময় কাজের ফাঁকে পাখির ছবিও এঁকেছেন, একটি ব্যবহার করা গেছে। তাঁদের অনেকের আছে ফুলগাছ বা বাগানের শখ, সে-ছবিও আছে কিছু। পাখি নিয়ে কথা কারো লেখায় বেশি কারো লেখায় কম এসেছে, কারো কাছে হয়তো তাঁর বাচ্চা মেয়ে পাখির মতো। লেখা নেওয়ার সময় লেখক অলেখক বিভাজন করা হয়নি, আলোকচিত্রের ক্ষেত্রেও তাই। কোনো নির্দেশিকা ছিল না, বানানে সমতা আনার কষ্ট প্রচেষ্টা, বা ইংরেজি শব্দের

প্রতিবর্ণীকরণ ছাড়া বিশেষ কিছুই সংশোধন বা পরিমার্জন করা হয়নি। এঁদের বয়স আশি থেকে তিরিশের মধ্যে। অধিকাংশই স্কুল, কলেজ বা অফিসে কর্মরতা, কয়েকজনের কাজ তাঁদের বাড়িতেই। ত্রয়োদশী দুর্গার ইস্কুলে যাওয়া লকডাউনে আপাতত বন্ধ, সে দেখেছে পাখির বাসা হারানোর ছবি। একজন রয়েছেন যাঁকে প্রতি দিন বা রাতেও কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনের জন্য বাইরে বেরোতে হয়েছে, আমাদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের জন্য। তাঁর লেখা রইল সব শেষে।

আমাদের কাজ শুধু সংকলনটিকে পাঠকের হাতে পৌঁছে দেওয়া। সচেতন পাঠক পাঠের পর তাঁর দৃষ্টিতে হয়তো দেখতে পাবেন আরও অনেক কিছুই। বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ‘প্রকৃতি’-র প্রতি ‘হরপ্পা’র প্রণাম এই সংকলন।

নন্দিনী নাগ ১৩
শ্যামলী দাস ২৩
বর্ণালী পাইন ২৭
মালা ঘোষ ৩৩
দুর্গা দাশগুপ্ত ৩৭
ভাস্বতী ব্যানার্জী ৪১
পলাশপ্রিয়া বন্দোপাধ্যায় ৪৫
প্রত্যুষা দে ৪৯
সোমা ভট্টাচার্য ৫৫
জয়তী বিশ্বাস ৫৯
মনামী সিংহরায় মুখার্জি ৬৫
প্রজ্ঞাপারমিতা কুণ্ডু ৬৯
বিদিশা দত্ত ৭৩
শর্মি গাঙ্গুলি ৭৭
শিঞ্জিনি পাল ৮১
মাহরীন ফেরদৌস ৮৭
কৌশিকী বসু ৯৩
পিয়ালী বন্দোপাধ্যায় ৯৯
সৃজনী সাধুখাঁ লাহিড়ী ১০৩
সুচরিতা চক্রবর্তী ১০৭
তিয়াসা প্রামাণিক ১১৩
পিয়ালী রায় ১২৫
মেঘনা বসুমল্লিক ১৩৩

দিনটা ছিল একুশে মার্চ, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পরিদর্শকের দায়িত্ব শেষ করে বাড়ি ফিরে আসার পথে যখন খবরটা শুনেছিলাম, তখন বেশ স্বস্তি পেয়েছিলাম। মার্চের শুরু থেকেই দেশে কোভিডের আতঙ্ক, তার মধ্যে বিভিন্ন অপরিচিত জায়গা থেকে আসা অত পরীক্ষার্থীর সঙ্গে প্রতিদিন খুব কাছাকাছি থেকে সময় কাটানোর ব্যাপারটা বেশ উদ্বেগের ছিল। তাই পরীক্ষা স্থগিত রাখার ঘোষণা শুনে বেশ ভালো লেগেছিল।

ক-দিন আগে থেকে অন্য বোর্ডের পরীক্ষা স্থগিত হয়ে গেছে, বেশ কিছু বেসরকারি সংস্থা তাদের কর্মীদের বাড়ি থেকেই কাজ করার নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে। আমাদের বাড়ি থেকে একমাত্র আমাকেই রোজ বেরতে হচ্ছে, যে দিনগুলোয় পরীক্ষা নেই, সেই দিনগুলোতে স্বাভাবিক নিয়মে ক্লাসও চলছে। এদিকে আমার তখন মাথার ওপর কাজের পাহাড়, মাধ্যমিক পরীক্ষার খাতা রয়েছে, দু-দিন বাদে উচ্চমাধ্যমিকের খাতাও এসে পড়বে, সেগুলো দেখার জন্য হাতে নিতান্তই কম সময়। পেশা ছাড়াও নেশার কাজেরও চাপ রয়েছে, নতুন উপন্যাস লেখা শুরু হয়ে থমকে আছে, তাছাড়া বেশ কিছু পত্রিকায় লেখা দেবার অঙ্গীকার করা আছে, সেগুলোও এইসময়েই সেরে ফেলতে হবে!

'সময়' নিয়ে যখন এমন খারাপ সময়ে রয়েছি, তখন হিসেবের বাইরে হঠাৎ ছুটি স্বভাবতই পেয়ে দারুণ খুশি হয়েছিলাম!

বাইশ তারিখ রবিবার, জনতা কারফিউ আর তেইশ তারিখ থেকে গোটা দেশে পড়ল তালাচাবি, আমাদের রাস্তায় পড়ার জুতোগুলোর ওপর জমতে শুরু করল ধুলো, বদলে গেল আমাদের সবারই জীবন।

সেইদিনের পর থেকে যে 'আমি'কে প্রতিদিন দেখা যাচ্ছে ছোট্ট ফ্ল্যাটবাড়িটার চার-দেওয়ালের মধ্যে, সে এক অন্য 'আমি', যার সঙ্গে আমার নিজেরই পরিচয় হয়নি কোনোদিন!

আমাদের বাড়ির নানা কাজে যারা সাহায্য করে এসেছেন এতদিন, সেই মহিলাদের বাড়িতে প্রবেশ নিষিদ্ধ হল, ফলে আমাকেই এদের প্রত্যেকের ভূমিকায় মঞ্চে হাজিরা দিতে হচ্ছে

প্রতিদিন! আমার মধ্যে যে এত প্রতিভা লুকিয়ে ছিল, 'লকডাউন' না-হলে সে খবর আমি জানতেই পারতাম না!

একই সঙ্গে আমি 'রমলা', 'কমলা', 'বিমলা'র ভূমিকায় সুন্দরভাবে বাসনমাজা, ঘর পরিষ্কার, রান্নাবান্না এই জাতীয় কাজগুলো 'প্রত্যাবর্ত ক্রিয়া'য় সম্পন্ন করে চলেছি টানা দু-মাস ধরে, সেইসঙ্গে আবার 'মা', 'বউ', 'বউমা' হয়েও লড়ে যাচ্ছি চব্বিশঘণ্টাই।

শেষোক্ত তিনটে ভূমিকা আগেও ছিল যদিও, তবে সে পার্টটাইম পার্ট করার কাজ ছিল, চরিত্রও অনেক ছোটো থাকত, এখনকার মতো চব্বিশঘণ্টা মঞ্চে পড়ে থাকতে হত না! পার্টটাইম ছোটো রোলে অভিনয় করার সুবিধা অনেক, দোষত্রুটিগুলো ধরা পড়ে কম, কিন্তু বড়ো চরিত্রে, সারাক্ষণ মঞ্চে থাকলেই বড্ড বিপদ, দর্শকেরা সবাই 'চোখে আঙুল দাদা' হয়ে ওঠে।

আর 'রমলা', 'কমলা', 'বিমলা' রা যেহেতু বাইরে থেকে আসে, তাই তাদের মাঝেমাঝে না-আসার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে, নৈতিক অধিকারও থাকে। কিন্তু আমাকে যখন তাদের অনুপস্থিতিতে 'প্রক্সি' দিতে হচ্ছে, তখন আমি সেই 'কামাই' করার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত! হা হতোস্মি!

এই দুঃসময়ে কেবল বাইরের ঘরের আসবাবেই যে বদল হয়েছে তা নয়, বদলে গেছে ভেতরের ঘরও। ঘড়ির কাঁটার চোখরাঙানিতে অভ্যস্ত এত বছরের জীবন থেকে এখন 'সময়' নামক শব্দটাকেই ছেঁটে ফেলা গেছে নিতান্ত অদরকারি বলে, এমনকি শরীরের মধ্যে থাকা জৈবিক ঘড়িটার মাথাও দিব্যি গুলিয়ে দেওয়া গেছে এই দু-মাসে। ভোর চারটেতে ঘুমাতে

যাওয়া, রাত দেড়টায় চা খাওয়া কিংবা বেলা বারটায় জলখাবার খাওয়া নিয়ে, সে-ও কোনোরকম আপত্তি তোলে না, বিনা ঝামেলায় মেনে নেয় আমার সব উপদ্রব।

এ ব্যাপারে আমার নিজস্ব একটা যুক্তি আছে। যেমন রবীন্দ্রনাথের 'সময়হারা' কবিতার বাচ্চা ছেলেটার যুক্তি ছিল, ঘড়িতে দশটা বাজা যদি বন্ধ হয়ে যায়, তবে আর স্কুলে যাওয়ার দরকার নেই, তেমন আমার উলটোরকম যুক্তিতে স্কুলে যাওয়াই যখন বন্ধ, তখন আর দশটা বাজারই দরকার নেই।

সেই কোন্ ছোট্টবেলায় স্কুলে ভর্তি হবার পর থেকে শুরু হয়েছিল দৌড় আর দৌড়, নানান কিসিমের দৌড়, বিভিন্ন দূরত্ব অতিক্রম করার দৌড়! কখনো থেমে, বসে জিরিয়ে নেওয়ার সময় হয়নি। ভেবেছিলাম চাকরি থেকে অবসর নেবার পরই খানিকটা ফুরসত মিলবে। কিন্তু একশো মিটার দৌড়ের খেলাটা যে এমন হঠাৎ করে বুকে ছেঁচড়ে এগোনোর খেলাতে বদলে যেতে পারে, সেটা কেউ-ই আঁচ করতে পারেনি। এখন হাঁটা বলতে বুঝি, বাড়ির মাপা চৌহদ্দিতে গুনে-গুনে কয়েকটা পা ফেলা।

মে মাসে একবার স্কুলে যেতে হয়েছিল, মিড ডে মিলের চাল-আলু দেবার জন্য, লকডাউনের একমাস বাদে সেই প্রথম বাইরে পা রাখা। সেদিন এতবছরের চলাচলের রাস্তাটাকেও অচেনা লাগল বড়ো।

ফাঁকা স্টাফরুমে একদম একা দাঁড়িয়ে বুকের মধ্যে হু-হু করে করে উঠেছিল সেদিন। কে জানে আবার কবে এই খালি, ধুলোজমা টেবিলগুলো উপচে পড়বে ছাত্রীদের খাতায়, আবার কবে একসঙ্গে বসে আমরা অনেকগুলো রান্নাঘর থেকে আসা খাবার

ভাগাভাগি করে খাব, ভাগ করে নেব নিজেদের দুঃখসুখগুলো সহমর্মী সহকর্মীদের সঙ্গে! আমরা যারা দিনের বেশিটা বাইরেই কাটাই, তাদের পরম আত্মীয় হয়ে ওঠে সহকর্মীরাই, যেসব কথা পরিবারের লোকেরাও জানতে পারে না, অবলীলায় বলাবলি হয় পাশের চেয়ারের বন্ধুটির সঙ্গে।

কাবার্ডটা খুলেছিলাম, দরকারি কয়েকটা বই বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। অনলাইন ক্লাস নিচ্ছি, এদিকে বাড়িতে বইপত্র কিছুই নিয়ে যাওয়ার সুযোগও হয়নি আচমকা লকডাউন হয়ে যাওয়ায়।

বই সরাতেই ভেতর থেকে মুখ বাড়াল চায়ের কাপ, বিস্কুটের কৌটো। মনে পড়ে গেল, একটা ক্লাস নিয়ে আর একটাতে ঢোকার আগে, ঝট করে চায়ে চুমুক দিয়ে শক্তি সংগ্রহ করে আবার ছুট দেবার দিনগুলোর কথা, সেই দিনগুলোতে বড়ো আদরের ছিল এই চায়ের কাপ।

প্রায় প্রতি সপ্তাহে সাতদিনই বাইরে বেরোতে হত, স্কুলের পরেও অনেক জায়গায় যাওয়ার থাকত নানা দরকারে। আর রবিবারে ছিল পরিবারের সঙ্গে বেড়ানো, সিনেমা দেখা, বাইরে খাওয়া কখনো-কখনো। তাই বাড়িতে পরার পোশাকের প্রয়োজন ছিল শুধু রাতটুকুর জন্য, বাইরের পোশাক পরেই দিনের বেশিটা সময় কেটে যেত। বিনা নোটিশে বাইরে বেরনো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ওয়ার্ডরোবও অপ্রস্তুত, সেখানে এখনও রয়ে গেছে কিছু জামা, যেগুলো দুই-একবার পরার পর আলমারিতে আটকা পড়ে গেছে। একদিন ওয়ার্ডরোবের পাল্লাটা খুলতেই ওর ভেতর থেকে জামায় রয়ে যাওয়া পারফিউম এসে ধাক্কা দিল নাকে, মনে পড়িয়ে দিল চলন্ত দিনগুলোর ছবি, কিছুক্ষণের জন্য মনটা খারাপ হয়ে থাকল।

জীবনের ধর্মই অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া, আমিও ব্যতিক্রম নই। পড়া, লেখা, গাছের পরিচর্যা, বহুদিনের জমে থাকা কাজ যেগুলো ইচ্ছে থাকলেও সময়ের অভাবে এতদিন করা হয়নি, সেসব করার মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছি দিব্যি, অনিয়মটাকেই নিয়ম বলে মেনে নিয়ে তার সঙ্গে খাপে খাপ বসিয়ে দিয়েছি এই এখনকার 'আমি'কে। ভার্চুয়াল ছাত্রীদের নিয়ে ক্লাসও করছি বেশ, যদিও প্রতি মুহূর্তে তাদের সত্যিকারের সঙ্গ 'মিস' করছি।

কড়া রুটিনের শাসনে থাকা জীবনে একটা মিষ্টি স্বপ্ন সবসময় আমি গোপনে লালন করতাম; বেশ কয়েকদিন যদি এমন ছুটি পাই, যখন কোনো কাজ থাকবে না, তখন প্রাণভরে ঘুমোব আর বিছানায় শুয়ে শুয়ে বই পড়ব।

নিশ্চয়ই এ স্বপ্ন আমার মতো আরও অনেকেই দেখতেন। দুপুরে ভাত খেয়ে উঠে জমিয়ে ঘুমোনোর জন্য আকাঙ্ক্ষা, এবং সেটা না-পাওয়ার কারণে আক্ষেপ আমি অনেকের মধ্যেই দেখেছি। তবে আমি এখন বেশ বুঝতে পারছি, গত দু-মাসে বাড়ির বিছানার থেকে বাইরের আকাশের প্রতি টানটাই তাদের কাছে তীব্র হয়ে উঠেছে, ঠিক আমারই মতো।

চিরকালই আমার পায়ের তলায় সর্ষে, চাকরিস্থল আর বাড়ির মধ্যে থাকত অনেকগুলো গন্তব্য। হতে পারে সেটা আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা নয়তো কোনো অনুষ্ঠান, কিংবা নেহাৎই কেজো ঘোরাঘুরি। সারাদিনের কাজের পর এইসবগুলো মস্তিষ্কে জোগাত অক্সিজেন, একঘেয়েমি কেটে যেত, বাড়িতে ফিরে আবার প্রসন্নমনে দ্বিতীয় ইনিংস খেলার জন্য মাঠে নামতে পারতাম! এখন তো একটাই ইনিংস, রান আসুক-না-আসুক, সারাদিন ধরে টুকটুক করে ব্যাটিং করে চলেছি।

তবে এই পরিস্থিতি অনেক কিছু শেখাল। বন্দিদশায় থাকাকালীন এমন অনেককিছু দেখলাম, অনেককিছুই নতুনভাবে ভাবলাম যা আগে কখনো ভাবিনি। আক্ষরিক অর্থে নখদন্তহীন, মস্তিষ্কবিহীন একটা আদ্যপ্রাণী, যে কিনা পোষকের দেহের বাইরে নেহাৎই ঠুঁটো জগন্নাথটি, জীবনের প্রকাশটুকুও করার সক্ষমতা নেই, তার থাবায় পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর মানুষদের অসহায় মৃত্যুমিছিল, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল মানুষের অহংকার কত ঠুনকো! প্রমাণ করে দিল সবার উপরে মানুষ নয়, প্রকৃতি সত্য। প্রকৃতি ইচ্ছে হলে ভাঙবে, ইচ্ছে হলে গড়বে, তার ক্রিয়াকে ঠেকানোর ক্ষমতা মানুষের নেই। এখানে কোনো ভেদ

নেই ধনী আর গরিব দেশের মধ্যে, কোভিড ভাইরাসটি সবাইকেই একঘরে করে দিয়েছে, একটা ঘরে বন্দি করে রেখেছে।

তবে সব চাইতে বড়ো আঘাত, বড়ো শিক্ষা হল আমার দেশের অন্নদাতাদের অন্নসংকট এবং অনুসারী যন্ত্রণার চিত্র চোখের সামনে দেখা। যাদের শক্তি নিংড়ে ঘোরে দেশের চাকা, সেইসব লাখ-লাখ শ্রমজীবী মানুষের সামাজিক অবস্থান, তাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি দেখে লজ্জিত হওয়া ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। ঘরে ফিরতে চাওয়া ঝড়ের পাখিদের মতো তাদের পায়ে হেঁটে রাজ্যান্তরে যাওয়ার প্রচেষ্টা দেখে এটুকু বোঝাই যায়,

তাদের সামাজিক অবস্থান কত অসুরক্ষিত, রাষ্ট্রের কাছে তাদের মর্যাদা কতটুকু! রাষ্ট্র তো আর আমাকে বাদ দিয়ে নয়, তাই এই অপরাধ আমারও, এই উপলব্ধি তাই আমাকেও পীড়ন করে।

হঠাৎ করে গৃহবন্দি হয়ে যাওয়ায়, এতদিনের অভ্যস্ত জীবনের ছন্দ হারিয়ে আর সকলের মতো আমারও মনমেজাজ মাঝেমধ্যে নিয়ন্ত্রণে থাকছে না ঠিকই, তবে লকডাউনের জেরে একরাজ্য থেকে আরেকরাজ্যে ফিরতে চাওয়া কাজ-হারানো শ্রমজীবী মানুষগুলোর সপরিবার দুর্ভোগের চিত্র দেখছি, ঝড়ে খেতের ফসল, চারদেওয়ালের নিরাপত্তা হারানো বিধ্বস্ত মানুষগুলোর খোলা আকাশের নীচে এসে দাঁড়ানোর ছবি দেখছি, এই পরিস্থিতিতে কাজ হারিয়ে ফেলা হাজার-হাজার মানুষের অসহায়তার কথা জানতে পারছি, তখন নিজের এই মনখারাপ করার বিলাসিতাটাকে তুচ্ছ বোধ হচ্ছে। সোনার খাঁচায় আরামে বসে, খাঁচার দরজা ঠোকরাতে থাকে যে পাখি, নিজেকে সেই পাখির মতো মনে হচ্ছে! যেন আমি সেই সোনার খাঁচার পাখি, যার দানাপানি, আশ্রয় সবই আছে, কেবল খোলা আকাশটাই নেই!

নন্দিনী নাগ
হালতু, কলকাতা

পিঁজরায় বদ্ধ থেকে হাঁপিয়ে উঠছিলাম। অভিযোগ করে লাভ নেই, কাকে করব? তাই যখন দেখলাম একজন-দুজন করে বেশ ক-জন ভোরবেলায় হাঁটতে বেরিয়ে পড়েছে, আমরা দুজনও ঠিক করলাম বেরিয়ে পড়ব। পাশেই বিনয় ভবনের বিস্তীর্ণ এলাকা গাছগাছালিতে ভরা মাঝখানটা, তার চারধারে ফাঁকা মাঠ। দূরে-দূরে দু-চারজনকে দেখা গেলেও ছোঁয়াচ লাগার তেমন কোনো

আশঙ্কা আছে বলে মনে হল না। তবু মুখে 'মাস্ক' লাগিয়ে রাখলাম।

আমাদের বাড়ির বাগানে পাখির কলতান যতটা শোনা যায়, তাদের তেমন দেখা পাওয়া যায় না। বিকালে সোম যখন গাছে জল দেয় তখন একটি-দু-টি করে বুলবুলি এগিয়ে আসে ধারাস্নান করতে। কখনও-সখনও দোয়েলকে দেখা যায়— লেজ উঠিয়ে তিড়িং-তিড়িং করে জলের কাছাকাছি। কিন্তু এই সুন্দর সকালবেলায় প্রায় জনবিহীন গাছগাছালির মধ্যে অবহেলায় টিকে থাকা পাশের আমবাগানের গাছে-গাছে কিংবা ফাঁকা মাঠের বালি আর ঘাসে কত যে পাখি দেখতে পাই হাঁটতে-হাঁটতে—তার পুরো বিবরণ দেওয়া আমার পক্ষে সহজ নয়।

ছোটো বয়স থেকে শহরের পিঁজরায় বড়ো হয়েছি। পাখির মধ্যে কাক, চড়াই, ঘুঘু আর কিছু শহরের প্রায় পোষমানা পায়রা। শান্তিনিকেতনে এসে— ওই অবিরাম তাল ঠুকে ডাক দেওয়া বসন্তবৌরী, কর্ণপটাহবিদারী ছোট্ট কাঠঠোকরা বা বইয়ে পড়া তীক্ষ্ণকণ্ঠ মাছরাঙা কিংবা মধুকণ্ঠী কোকিলের ডাক ও গান শুনতে

পাওয়ার সৌভাগ্য যে হতে পারে—তা-ও এত কাছ থেকে ভোরের স্নিগ্ধতায় যে তাদের দেখতে পাব, ডাক শুনতে পাব, গান শুনে উচ্চকিত হব এতটা যে ভাবাই যায়নি।

গাছের ডালে যতটা নয় মাঠের ধুলোবালিতে যাদের দেখতে পাই তাদের সঙ্গে কিন্তু আগে পরিচয় ছিল—তারা হল শালিখ। সেই কোন্ মেয়েবেলার শুরুতে বাড়ির সামনের মাঠে (এখন সেখানে বহুতল) যখন এক্কা-দোক্কা খেলতাম তখন একটা-দুটো পাখির দেখা মিলত। একটা বিশেষ পাখি দেখা গেলে খেলার সাথী মিনু খেলা বন্ধ করে আরও একটা সঙ্গী-পাখিকে খুঁজতে থাকত, কারণ সে বলত, "জানিস না বুঝি One for sorrow আর two for joy?" বেশি দেখতে পেলে আরও ভালো থ্রি ফর বেটার আর ফোর ফর টয়। এখানে কখনও-কখনও একটা দুটো তিনটে শুধু নয় এক ঝাঁক শালিখ দেখতে পাই। গোরুদের চরার সময় তাদের পাশে সঙ্গীর মতো গো-শালিখও দেখি। আর দেখি একটু অন্যরকম দেখতে হলুদ-সাদা ছিটেওয়ালা গাংশালিখ। খেলনা, চিঠি, আনন্দ বা দুঃখ পাওয়ার জন্য নয়, তাদের দেখে মন চলে যায় সেই ছোটোবয়সের দিনগুলোয়। তবে সে পিঁজরাবন্ধ দিনের থেকে আজকের পিঁজরাবন্ধ দিনের অনেক তফাত!

শ্যামলী দাস
শান্তিনিকেতন

যন্ত্র-জন্মে আমরা প্রকৃতি-জন্মকে নিয়ে ভাবতে শিখেছিলাম কিনা আজ আর মনে নেই। মনে হয়, কোভিড-১৯-এর আতঙ্ক আমাদের চোখ খুলে দিচ্ছে। ঘরবন্দি দশা, নিয়ত সংক্রমণের ভয়, মৃত্যুর আশঙ্কা, ব্যাধি নিয়ে রাজনীতিকরণ—সব আমাদের প্রাত্যহিক বাস্তব।

পাখিকে খাঁচায় বন্দি করে না-জেনে যে বিকৃত রুচির পরিচয় আমরা দিই, আজ হয়তো টের পাচ্ছি তা কত বড়ো শাস্তি পাখির জন্য। সমস্ত আকাশ যার ঘর তাকে আমাদের চোখের সুখের জন্যে আর অবচেতনে দুর্বলকে বেঁধে রাখার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে আমরা খাঁচায় পুরে পাখিটির ডানা দুটোকে অকেজো করে দিই। মার্চ ২০২০-র তৃতীয় সপ্তাহ থেকে বিশ্বজোড়া লকডাউনে সামিল আমার দেশ। সমস্ত ছন্দ ভেঙে গেছে জীবনের। আমাদের ঘর আছে তাই ঘরে সিঁধিয়ে আছি। শ্রমজীবী মানুষের পায়ে হেঁটে বাড়ি ফেরা দেখে কাতর হয়েছি। আর পাশাপাশি নিজেকে কেমন জড় বস্তু বলে মনে হয়েছে।

ভাগ্নিস থাকি উত্তর-পূর্ব কলকাতার কালিন্দীর এমন একটি জায়গায় যার পাশেই পুকুর, নানাবিধ গাছ। সেই সূত্রে নানা সময়ে চোখে পড়ে নানা রকম পাখি। তাদের খাঁচায় ভরার অন্যায় উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে আসেনি কেউ। দোয়েল, হরিয়াল, বুলবুলি, পানকৌড়িদের দেখলে মন ভালো হয়ে যায়। যেন নিজের বন্দি দশা, নিজের ক্লীবতা খানিক প্রাণ পায় ওদের ডানায়, নরম পালকে। চড়াইরা কত আসত। এখন কেন কম বুঝতে পারছি না। জানলায় পাখিদের জন্য খাবার রাখা অভ্যেস আমার। এখন ক্রমে শালিক, চড়াই আসছে খুব কম। অথচ এখন শ্বাস টেনে নিলে বুক ভরে। বেশ লাগে। কিন্তু তারপর হারিয়ে যাই চরম

অনিশ্চয়তায়। পাখিদের মিতালি, কণ্ঠস্বর, ঝগড়া, দুষ্টুমির মধ্যে জীবন পাই।

ভালো থাকি।

মনে হয় পারব, আমরা পারব।

নত হই প্রকৃতির পায়ে।

আর একটি কথা। আমাদের পায়ে এখন কোভিডের বেড়ি তাই বলি, আমার প্রতিবেশীর বাড়ির খাঁচায় বন্দি টিয়াটি কিন্তু বেশ অদ্ভুত। পরিস্থিতির বাস্তব সে স্বীকার করেছে । সারাদিন খাঁচায় খায়দায় আর কখনও ক্লান্ত থাকে না। মুখে তার মানুষের

একটিই ভাষা—এসো এসো। তার বিশেষত্ব অন্য জায়গায়—সে ক্রিং-ক্রিং করে ফোনের মতো ডেকে চমকে দিতে পারে যখন-তখন। এত শব্দ থাকতে ওই শব্দটি ওকে টানল কেন জানি না বাপু। শুধু মনে হয় ও যেন কোনো অজানা অচেনা নম্বরে রোজ ডায়াল করে লাল ঠোঁট দিয়ে। সেই শব্দ ওর কাছেই ফিরে আসে। পৌঁছয় না কোথাও। কারণ, অজানা অচেনা নম্বরটি হারিয়ে গেছে সভ্যতার পুরোনো হলুদ ছেঁড়া পাতায়। ও জানতে চায় ডানাকে বন্দি করার চাতুর্য তো পেলে নখদর্পণে কিন্তু সেই চাতুর্যে নিজেদের স্বভাব সৌন্দর্য যে বরবাদ হয়ে গেল, নদীতে বাঁধ দিয়ে নদীর ক্ষতি করলে, বন্যায় ভাসিয়ে দিলে গরিবের ভিটে মাটি।

পৃথিবী কি বাসযোগ্য আছে আর? বাসযোগ্যতা ফিরে পেতে এসো এসো এসো। প্রকৃতির কোলে মাথা রাখো।

বর্ণালী পাইন
কালিন্দী, কলকাতা

বাবুই পাখিরে ডাকি' বলিছে চড়াই,—
"কুঁড়ে ঘরে থেকে কর শিল্পের বড়াই?
আমি থাকি মহাসুখে অট্টালিকা 'পরে
তুমি কত কষ্ট পাও রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ে!"

এই কবিতাটি ছোটোবেলায় পড়তাম আর ভাবতাম চড়াই পাখিটা কী বোকা! আমরা দু-হাত মেলে নীল আকাশে উড়তে

চাই, আর ও ঘরে থাকতে চায়! ওকে করুণা হত। এই গৃহে অন্তরীণ সময়ে সকালে বারান্দায় বসে যখন চা খাই, তখন সামনে অনেক পাখির ওড়াউড়ি দেখতে পাই। কিন্তু চড়াই এসে বসে আমার সামনে, তার সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেছে। এসে চিড়িক-চিড়িক করে, আবার আমার পাশ দিয়ে উড়ে ঘরে ঢুকে যায়— দেখতে কী যে ভালো লাগে! মনে হয় ওর কী মজা! ওর যা ইচ্ছে তাই করতে পারে! আর আজ আমি বন্দি! কত রকম পাখির ডাক শুনতে পাই— বসন্তবৌরী, বেনে বউ— এই গাছ থেকে ওই গাছে উড়ে যায়, মনের আনন্দে। ছোটো-ছোটো বুলবুলি, টুনটুনি পাখি ফাঁকে-ফাঁকে বসে আছে আর পাজি কাক ওদের উত্যক্ত করছে। পরিবেশ নির্মল হয়ে গেছে তাই পাখিরাও খুব খুশি। চড়াই পাখিরা বুঝে গেছে— এরা আমার বন্ধু, তাই চোখের সামনে বসে ক্রমাগত প্রিক-প্রিক করে ডাকছে। আবার

মাঝদুপুরে আমার বারান্দায় ঘুঘু এসে বসে নিস্তব্ধতা ভেঙে ডেকে ওঠে। আগে কাজের ব্যস্ততা ও বাইরে ঘোরাঘুরির জন্য এইসব চোখের বাইরে রয়ে গিয়েছিল। এখন আবার ছোটোবেলার মতো গাছপালা, মাঠ, আকাশকে আপন মনে হয়—মনে হয় আমি যেন টাইম মেশিনে চড়ে সেই সময়ে ফিরে গেছি, যখন কোনো চিন্তা ছিল না— শুধু নির্মল আনন্দ ছিল। পাখিদের ওড়াউড়ি দেখতে পাওয়া গান শুনতে পাওয়া এগুলি আমার লকডাউন-এর পাওনা।

মালা ঘোষ
পিকনিক গার্ডেন, কলকাতা

বাগানের পাঁচটা সুপুরি গাছের মধ্যে একটা গাছ কবে যে মরে গিয়েছিল তা আমি বুঝতে পারিনি। বুঝতে পারলাম এই দু-চার মাস আগে যখন দেখলাম গাছের গায়ে দু-টো ফুটো। দু-টো ফুটো একেবারে সমান মাপের কোথাও এতটুকুও অমিল নেই, কেউ যেন বাটালি দিয়ে ফাঁপা গাছের গায়ে গর্ত করে দিয়ে গেছে। খুব কৌতূহল হচ্ছিল ফুটো দু-টোর ভেতরে কী আছে দেখার, আর জানার কেই-বা করল এই ফুটো?

সেদিন দুপুরে না-ঘুমিয়ে, একটা বেশ ভালো গল্পের বই পড়ছিলাম, খুব মন দিয়ে পড়ছিলাম। আশেপাশে কী হচ্ছে তার ওপর নজর ছিল না। হঠাৎ একটা শব্দে চমকে উঠলাম—কেউ যেন একটানা খেলনা বন্দুক চালাচ্ছে—শব্দটা বাগানের সেই সুপুরিগাছগুলোর দিক থেকেই আসছিল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি একটা বেশ রং-চঙে পাখি সরু লম্বা ঠোঁট, গাছের ফুটোর কাছে বসে আছে। খুব যেন চেনা চেনা মনে হল। মনে করবার চেষ্টা করলাম কোথায় দেখেছি-কোথায় দেখেছি। হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলকের মতো মাথায় আসল লাইফ সায়েন্স বইতে এখন আমাদের পাখির এ্যানাটমি সম্বন্ধে পড়াচ্ছে, সেখানে বহু পাখির ছবি আছে, আর এই পাখিটা তো সেইটা যার তলায় লেখা উডপেকার অর্থাৎ কাঠঠোকরা। তবে এই বোধহয় ঠোঁট দিয়ে ঠুকে-ঠুকে ফাঁপা গাছের গায়ে গর্ত করে ডিম পেড়েছে। সেদিন থেকে রোজই দেখতাম কাঠঠোকরাটাকে, মুখে খাবার নিয়ে আসে। তবে বোধহয় ডিম ফুটে ছানা বেরিয়েছে। প্রতিদিন দুপুরে সুপুরির গাছের দিকে তাকালেই দেখা যেত ওকে।

উনিশে মে, লুকিয়ে-লুকিয়ে খুব সন্তর্পণে গিয়ে পাখিটার একটা ছবি তুলেছিলাম, ভাগ্যিস দেখতে পায়নি আমায়। মনে হয়েছিল, বাচ্চাগুলো বড়ো হলেই তো উড়ে যাবে, তাই একটা ছবি তুলে রাখি। বিশে মে বিকেল পাঁচটায় খবরে দেখেছিলাম অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় আমফান স্থলভাগে ঢুকে পড়েছে, এগিয়ে আসছে কলকাতার দিকে। সন্ধ্যা সাতটা থেকে শুরু হল মারাত্মক ঝড়। একের-পর-এক গাছ পড়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে হাওয়ার ভীষণ শোঁ শোঁ আওয়াজ আর লোডশেডিং। বাড়িতে ঝড়ের ঝাপটা আসছে প্রবলবেগে। তখন সেই ফাঁপা গাছ ও কাঠঠোকরার ছানাদের কথা মনে করবার ফুরসত ছিল না। ঝড়ের তাণ্ডব থামতেই দেখলাম সুপুরি গাছ গেছে ভেঙে। সারারাত পাখির ছানাগুলোর জন্য মনটা খুব উদ্বিগ্ন ছিল। পরদিন খুব ভোরে যখন গাছ কাটার তোড়জোড় হচ্ছে, তখন দেখি মা-পাখি কখন যেন তার ছানাদের নিয়ে উড়ে গেছে, আর বোধহয় কখনো আসবে না ওরা। প্রকৃতির প্রচণ্ড রোষে বহু মানুষ আজ যেমন গৃহহীন উদ্বাস্তু, তেমনি এই তাণ্ডবের মুখে অসংখ্য পশুপাখিও ঘরছাড়া উদ্বাস্তু। কাঠঠোকরা আর তার ছানারাও বাসাবদল করল প্রকৃতির এই রোষের মুখে পড়ে। খবরে শুনি এমন করতে হচ্ছে অনেক মানুষকেও।

দুর্গা দাশগুপ্ত
অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী, কলকাতা

বারান্দা থেকে বক দেখি।

সামনের বাগানে উঁচু-উঁচু গাছে বকের বাসা অনেক দিনের। তিন-চার রকমের বক। এবার নতুন এসেছে পানকৌড়ি। ভোর থেকে দুপুর দুপুর থেকে সন্ধে, শুকনো কাঠি ডালপালা সংগ্রহে ব্যস্ত। বকগুলো খুবই স্মার্ট। বৃষ্টি ঝোড়ো হাওয়া কোনো কিছুই সিরিয়াসলি নেয় না। ঝোড়ো বাতাসে সার্ফিং করে। তবে মুখ ফসকে দু-একটা ছোটো মাছ গাছ তলায় পড়ে যায়।

হঠাৎ ঘূর্ণিঝড় চিন্তার সুতোগুলো এলোমেলো করে দেয়।

এতদিনে জেনে গেছে ওরা। এতদিনে নিশ্চয়ই চিনে গেছে আস্তাবলের ধূর্ত ঘোড়াগুলিকে; তাদের গতিকে। জেনেছে দেশ বলে কিছু নেই। থাকলেও ওদের জন্য নয়। দেশ কেবল মাঝারিদের আত্মতুষ্টির মুষ্টিভরা মায়া। এমনকি কখনো কখনো একটা বিকার। দেশ তৈরি করে ওরা হারিয়ে যায় কালে।

সারি-সারি ক্লান্ত শরীর রেললাইনে শুয়ে। ঘুমিয়ে পড়বে একটু পরেই। কো-মরবিডিটি কতরকম কে জানে! হয়তো সবাই জানে। না-জানার ভান করে থাকে। স্পেশাল ট্রেন! স্পেশাল ট্রেন! ঘরে ফেরা যাক। অনেকেই ঘরে ফেরে ট্রেনের ভেতরেই।

সাদা বক, রঙিন বক, কালো পানকৌড়ি। আম গাছে, জাম গাছে , বকুল গাছে। হঠাৎ চার-পাঁচটা সাদা বক মিলে একটা

তরুণ পানকৌড়ির গলায় হাঁটু গেড়ে বসে। পানকৌড়ি মৃত্যুর আগে ছটফট করার সুযোগটুকুও পায় না।

সূর্যাস্তের আগুনে জ্বলে ওঠে আম গাছ। আগুন ছড়িয়ে পড়ে আম থেকে জামে। জাম থেকে বকুলে।

ভাস্বতী ব্যানার্জি
আসানসোল

রাস্তা দিয়ে যেতে-যেতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিতে-দিতে ফোনে কথা বলতে-বলতে জানালার বাইরে তাকিয়ে একটু লক্ষ করলে হয়তো আগেও দেখা হয়ে যেতে পারত ওর সঙ্গে। হয়নি। কখনো সময়ের অভাবে কখনো মনের, কিন্তু আজ তিন-চার সপ্তাহ প্রায় রোজই এই এক সময়েই একদৃষ্টে আলাদা করে কিছু না-দেখতে চাওয়া সত্ত্বেও ওর সঙ্গে দেখা হয়। ও আর ওর সাঙ্গপাঙ্গরা ভীষণ কথা বলে আর একটু লক্ষ করলে আর

ক-টা দিন গেলেই হয়তো ওরা কী নিয়ে এত কথা বলছে সেটাও বুঝতে পারব। অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমার ছোটো শহরে আমি এমন অনেক শালিক চড়ুই কাঠবিড়ালি প্রজাপতিদের সঙ্গে কত কথা বলেছি ছোটোবেলায়। আজ এই লকডাউনের ফুরসতে ওরা আমার সেই ছোটোবেলার বন্ধুদের কথা মনে করিয়ে দিল। আচ্ছা ও ভিনদেশের পাখি বলে কি ভিন ভাষায় কথা বলে! না মানে ওর সঙ্গে যদি আমার বাড়ির বাগানের শালিক চড়ুইগুলোর দেখা হতো ওরা কি একই ভাষায় কথা বলত? নাকি শহুরে পাখিদের ভাষা আমাদের গ্রামের পাখিগুলোর থেকে আলাদা?

আচ্ছা এমনও তো হতে পারে, ও আমারই মতন। ছোটো বাগানের গণ্ডি পেরিয়ে উড়তে চেয়েছিল। অন্য শহর কেমন হয় দেখতে চেয়ে হয়তো উড়তে-উড়তে আমারই বাড়ির বাগান বা

আশেপাশে থেকে এতটা দূর চলে এসেছে। ও হয়তো-বা বাড়ি ফিরতে চায়, বাবা-মা-র কাছে যেতে চায়, কিন্তু বড্ড ক্লান্ত—ঠিক আমারই মতন।

ও কি ক্লান্ত? ওর কি আর উড়তে ভালো লাগছে না?

পলাশপ্রিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়
দিল্লি

নিঃশব্দ রাতে ছাদে এসে দেখি মেঘলা আকাশে মনখারাপের ছায়া-ছায়া চাঁদ। আবছা আলোয় কয়েকটা নারকোল গাছ প্রতিদিনের মতো আজও দাঁড়িয়ে, কেউ মাথা উঁচু করে, কেউ ঘাড় হেলিয়ে চাঁদের আলো মাখছে। কিছু রাতপাখির ডানা ঝাপটানো, আর কিছু স্বর—ঝিঁঝিঁ পোকার, ব্যাঙের। গাছের কোটরে, পাতার আড়ালে, জলের পাশে নিজেদের ঘরে ওরা নিশ্চিন্ত। জন্মে থেকে হয়তো প্রথমবার এত নিশ্চিন্ত ওরা। ওরা

দিন গুনছে না, রাত গুনছে না। কিন্তু আমরা মানুষেরা জানি ধোঁয়া, ধুলো, চিৎকার, গাড়ির হর্ন, তেলকালি মাখা দিন আর রাতগুলো থেকে ওরা আজ সাতষট্টি দিন হল নিজেদের মতো নিশ্চিন্ত জীবন কাটাচ্ছে। আসলে মানুষ এখন এতটাই ঘরে যে ওদের প্রাণে এখন ভয়ডর কিছু নেই। কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই। এইসব ভাবছি আর চারদিকে দেখছি দূরের বাড়িগুলোও চুপচাপ। ঠিক এইরকম করে প্রতিরাতে লেখা হচ্ছে লকডাউনের আজ কাল পরশুর গল্প, আমার। শুধু পশ্চাদপট বদলে-বদলে যাচ্ছে। মেঘলা দিন কোনো দিন ঝোড়ো আর্তনাদের দিন, কোনোদিন একেবারে ঘুটঘুটটি কালো। সময়টা এখন সোম, মঙ্গল, বুধের চক্র থেকে মুক্তি পেয়েছে। দিনগুলোকে আলাদা করে খেয়াল না-করলে চিনতে পারি না। শুধু মুহূর্তগুলোকে ধরে রাখি, কখনো স্মৃতিতে, কখনো শব্দে, লেখায়, কখনো ছবিতে,

ক্যামেরায়। কিন্তু এই প্রিভিলেজড আমিটার এই সাধারণ দিন-কাটানোর রাত-কাটানোর গল্পটা আজকের নিরিখে বুঝতে পারি রূপকথার চেয়ে কম নয়! লকডাউনের কোলাজচিত্রে এ শুধু একটা টুকরো। অন্য টুকরোগুলো এই আত্মসুখ মুছিয়ে দেওয়া, ভিত কাঁপিয়ে দেওয়া অন্য দুনিয়ার ছবি। প্রতিদিন ভয়, প্রতিদিন আতঙ্ক। একদিনের কষ্ট, অবিচার কে মুছে দিয়ে পরের দিন আরও ভয়ংকর ছবি, অজস্র মৃত্যুর, লক্ষ মানুষের হাহাকারের। আমারই মতো এই দেশেরই মানুষ তারা, অন্য ঘরের, অন্য শহরের, অন্য গ্রামের। গৃহকোণে থেকে সংসারে প্রিয়মুখ দেখে সরল শান্তির জীবন প্রার্থনা করেছিল তারাও।

আসলে মহামারি, বিধ্বংসী ঝড়, মানুষের এত হাহাকার বোধহয় চোখে আঙুল দিয়ে আমাদের দেখাচ্ছে যে আমরা কত অল্পে বাঁচতে পারতাম, এখনও বাঁচতে পারি। আনন্দে বাঁচতে

গেলে আসলে চাই আমার পাশেরই আরেকজনের হাসিটাও, ছাদের তলায় রাতের নিশ্চিন্ত ঘুম যেন বরাদ্দ থাকে আমার মতো আরেকজনেরও। লকডাউন জীবনের এই পথটা খুঁজে পাওয়ার একটা পরিসর করে দিল বোধহয়। যখন সব স্বাভাবিক ছন্দে ফিরবে এই দিনগুলো কি ভুলে যাব? পাবলিক মেমারি নাকি খুব ছোটো, সব কিছুই স্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতে সময় লাগে না। নাকি আমরা স্বেচ্ছাতেই সব ভুলি...? আজকের শিশু, স্বপ্ন দেখি তুমি মনে রাখবে...

এই যে তুমি এত্তটুকু
হাতে পায়ে টলোমলো
মায়ের সাথে পথে জন্মে
এতটা পথ পথে কাটালে
যখন অনেক বড়ো হবে
হাতে পায়ে ডাগর আলো
কান্না মুছো কষ্ট মুছো
স্মৃতিগুলো জাগিয়ে রেখো
প্রদীপ যেমন অন্ধঘরে
মনে রেখো জন্মদিনে
জন্মক্ষণে রাস্তা হেঁটে
রক্তে ভেসে নগরপথে
এই ভারতে তোমার মা-ই জন্ম দিল।

প্রত্যুষা দে
কলকাতা

এখন জানালার ঠান্ডা গরাদে গাল চেপে ধরে আকাশ দেখি, দেখি ডানা মেলা পাখির অবাধ উড়ান। এখন অখণ্ড অবসরে পিছন ফিরে চাই, খুঁজে দেখি ঠিক বেঠিকের হিসাব। বন্দি তো চিরকালই ছিলাম, ও তেমন কিছু নতুন জিনিস নয়।

অফিস, সংসার, ছেলেপুলে, চিন্তা সব ছিল, ছিল না শুধু চৌকাঠ ডিঙানোর বাধা,

ছিল নাকি?...

কি..ই..ই..ই.... জানি?

কিন্তু হাজার নিষেধের বাধা তো ছিলই—

তবে আর নতুন কী হয়েছে, চারটে দেওয়াল ছাড়া!

এখন সবাই বলছে আমরা নাকি বন্দি হয়েছি, আচ্ছা বন্দির বিপরীত শব্দ তো স্বাধীন-মুক্ত, সত্যিই কি স্বাধীন-মুক্ত কোনো কালে ছিলাম? মুক্তি বড়ো কঠিন কথা, পাওয়া মুশকিল, সব গণ্ডি মুছে দিলেও পৃথিবীর গণ্ডি কী করে মোছা যাবে? আমরা সবাই এই পৃথিবীর কান্না, হাসি, ভালোবাসার গণ্ডিতে বন্দি।

আর স্বাধীনতা, মানে তো স্ব-অধীনে থাকা—সে খুব কঠিন কাজ, তার থেকে বন্দি থাকা সহজ, আর যদি নিজেকে স্বাধীন মনে করি তবে তো এই চার দেয়ালের গণ্ডি কোনো বাধাই নয়, আমি আর আমার মন প্রত্যেক দিন প্রতি মুহূর্তে পৃথিবীর প্রত্যেক

প্রান্তরে ঘুরে বেড়াই, উদীয়মান আর অস্তমিত সূর্যের লালিমায় করি স্নান, দুধেল জোৎস্না মাখি সারা গায়ে। আমি লকডাউনের আগেও কাজে চিন্তায় ভালো ছিলাম, এখনো ভালোই আছি।

তখন অবসর পাইনি আকাশ দেখার, এখন এই অখন্ড অবসরে নীচু মাথা উঁচু করে আকাশ দেখি, তোমায় দেখি পাখি, তোমার ডানায় ভর করে উড়িয়ে দিই মন সে কোন্ অজানায়, ভাবি আমি মুক্ত, আমি স্বাধীন।

সোমা ভট্টাচার্য
বারাকপুর

২০২০-র মার্চ মাসে যখন রঙের উৎসব দোল পালন না-করার সরকারি নির্দেশিকা জারি হল তখন খুব আশ্চর্য হয়েছিলাম। আমার এত বছরের জীবনে কখনো দেখিনি রঙের উৎসব স্থগিত হতে। তখনো বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারিনি যে কোভিড-১৯ নামক মারণব্যাধি সুদূর চিন দেশ থেকে আমাদের দেশেও পৌঁছে যাবে। ট্রেনে, বাসে, রাস্তাঘাটে বরং লোকের মুখে-মুখে বেশ হাসির ছলেই রোগটি নিয়ে আলোচনা হতে শুনছিলাম।

ধীরে-ধীরে ইটালি, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রতে যখন এই মারণব্যাধি প্রবলভাবে বিস্তারলাভ করল তখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী ২১ মার্চ জনতা কার্ফিউ-এর ডাক দিলেন। সমগ্র দেশজুড়ে মানুষ বিভিন্নভাবে তা গ্রহণ করল। কেউ মান্যতা দিল আবার কেউ-বা কেন সম্পূর্ণ একটা দিন নিষ্কর্মা থাকবে দেশ তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করল। ২৩ মার্চ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন ২৪ মার্চ থেকে ১৪ এপ্রিল দেশকে পুরোপুরি লকডাউন করা হল। যার বাংলা তর্জমা তালাবন্ধ দেশ। অপার বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম যে দীর্ঘ এতগুলো দিন সমস্ত কিছু বন্ধ থাকবে! এ-তো অষ্টম আশ্চর্য!

এই সময় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাও বন্ধ হয়ে গেল। মুদিখানার দোকানগুলোতে উপচে পরা ভিড়— খাদ্যসামগ্রী মজুত করার। এর আগেই স্কুল থেকে ফেরার সময় আমার চেনা দোকানে কিছু কেনার জন্য দাঁড়িয়ে মাথা খারাপ হবার উপক্রম হল... একজন কিনছেন ২ বস্তা চাল, বিভিন্ন রকমের ডাল, ১২ টা সাবান, কয়েক বোতল করে হ্যান্ড-ওয়াশ ও আরও কত কিছু। দোকানি বাবুয়াকে জিজ্ঞাসা করায় বলল, আপনিই শুধু জানেন না, যখন তখন দোকান বন্ধের নোটিশ আসতে পারে।

বাড়ি এসে জানানোয় তৎপরতা শুরু হল বাড়ির লোকের খাবার জিনিস কিনে আনার। শুরু হল তালাবন্ধ জীবন। তখন যেহেতু আমার নিজেরও টনসিলের প্রদাহ জনিত কারণে শরীরটা বেশ খারাপ ছিল, মনে করলাম ভালোই হল আর ছুটি কাটা যাবে না আমার। কিন্তু দু-তিন দিন পর থেকে যত বিভিন্নরকম খবর শুনতে লাগলাম টিভিতে, এক অজানা ভয়ে মনটা নিস্তেজ হয়ে

যেতে লাগল। কোথাও যাবার উপায় নেই... বাইরে রীতিমত পুলিশের টহল... একমাত্র ছাদই বেড়ানোর জায়গা। ইতিমধ্যে ফেসবুকে একটি নাম দেখলাম যাকে নাকি অনুমান করা হচ্ছে কোভিড পেশেন্টরূপে... যার সঙ্গে আমাদের সামনের বাড়ির কাকিমার নাম হুবহু মিলে যায়... আর তিনিও তখন বেশ অসুস্থও ছিলেন... সে যে কী রাত কাটল... পরে দেখলাম ঠিকানা আলাদা... ধড়ে প্রাণ এল। তখনও বাজার খোলা থাকত দিনে। কিন্তু কয়েকদিন পর তা-ও বন্ধ করে দিল প্রশাসন। বাড়ির সামনে দিয়ে বিক্রেতারা ভ্যানে করে সামগ্রী নিয়ে যেতে লাগল। সকলের মুখ বাঁধা মাস্ক, কারোর-কারোর হাতে গ্লাভস। সবজি, ফল, ডিম, মাছ, মাংস সবকিছু বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে লাগল। ঈশ্বর যেন হাতে স্বর্গ এনে দিল। আগে তো এভাবে বাড়ির উপরে সবকিছু কোনোদিন আসেনি। মুড়ির প্যাকেট ছাড়া এখানে আগে মুড়িওয়ালা কখনো দেখিনি। এখন বাড়ির সামনে মুড়ির বস্তা

নিয়ে মুড়ি বিক্রি করতেও মানুষরা আসছেন। সারাদিন বিভিন্ন রকম খবর শুনে কোভিড অতিমারির ভয়াল রূপ যেন যমের মতো চেপে বসেছে ঘাড়ে। এক সপ্তাহ যে কীভাবে কাটল... রুগির সংখ্যা লাফিয়ে-লাফিয়ে বাড়তে লাগল...আগে রান্না করতে যা সময় লাগত এখন তো দ্বিগুণ বেশি লাগছে। সবজি, ফল কিনে কলের জলের তলায় ধুয়ে, তাকে রোদে শুকিয়ে তারপর রান্না করা। বাড়ির সমস্ত জায়গা যেগুলোতে হাত লাগে বার-বার সেই জায়গাগুলোকে স্যানিটাইজ করা... কাপড়-জামা রোজ সাবানজলে কাচা এসব করতেই বেশ সময় চলে যাচ্ছে এই তালাবন্ধ জীবনে।

স্কুলের মেয়েদের অনলাইন ক্লাস শুরু হল দ্বিতীয় দফা লক ডাউন শুরুর পরে... দুপুরে ১ ঘণ্টা করে প্রতিদিন ক্লাস নিচ্ছি রুটিন মাফিক... এটাও বেশ এক অন্য অভিজ্ঞতা... বেশ সাবলীল হয়ে উঠেছি ২ মাসেই। মেয়েদের পড়ানো, পরীক্ষা নেওয়া, অনলাইনেই নম্বর সমেত খাতার মূল্যায়ন করা... চলাকালীন হঠাৎ করে কোনো মেয়ে ১ কাপ চা অফার করল হঠাৎ একদিন। বিকেল ৫ টা তখন। বকলাম না আমি বরং বললাম কী সুন্দর দেখতে রে চা টা, যদি সত্যিই আমি এখন খেতে পেতাম! সে তো যারপরনাই লজ্জিত হল... এই সবের মধ্যে দিনটা যে কী করে কেটে যাচ্ছে এখন সেভাবে বুঝতেই পারি না।

আমফান নামক বিপুল গতির ঘূর্ণিঝড় এল এই সময়েই। কী দুর্বিসহ অবস্থা... ২০ মে রাতের প্রকৃতির রুদ্রমূর্তিকে ভুলতে পারব না জীবদ্দশায়... ২০ সালের বিষের ছোবলে মানব জীবন জেরবার হয়ে গেল। এইভাবে তালাবন্ধ জীবনকে নিয়ে চলেছি

আমি... ছাদে উঠে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হচ্ছি... ফুল, গাছ ও পাখি দেখছি... দেখছি ঘুড়ি ওড়ানোর অকাল বোধন। ফুলগাছের সঙ্গে সখ্য করছি... তালাবন্ধ জীবনে প্রথম-প্রথম হাঁফিয়ে উঠেছিলাম... কিন্তু মানুষ যে অভ্যাসের দাস বুঝতে পারছি এখন... কারণ তালাবন্ধ জীবনকে যেন অনেকটা নিজের করে নিতে পেরেছি আমি।

জয়তী বিশ্বাস
উত্তরপাড়া, হুগলি

করোনা ভাইরাস আমাদের জীবনে অনেক নতুন জিনিসের জন্ম দিয়ে গেছে—যেমন দু-টি শব্দের কোয়ারেন্টাইন ও লকডাউন। প্রথম যখন তেইশে মার্চ ডিক্লেয়ার হল লকডাউনের কথা, খুব একটা গুরুত্ব দিইনি। কী যে এর সুদূর প্রভাব পড়বে, বুঝতেও পারিনি। আস্তে-আস্তে দিন যত এগিয়েছে তত প্রভাবটা বুঝতে শুধু নয়, একদম হাড়ে-হাড়ে টের পেতে শুরু করলাম।

আমি একজন গৃহশিক্ষিকা, সুতরাং বাইরে মানে স্টুডেন্টদের বাড়িতে গিয়ে পড়ানো বন্ধ হল। কিন্তু এডুকেশন তো আর বন্ধ হতে পারে না, তাই নতুন একটা সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত হলাম, অনলাইন টিচিং। ইট ওয়াজ টোটালি আ নিউ এক্সপেরিয়ন্স। প্রথম দিকে প্রচুর অসুবিধা হচ্ছিল। কিন্তু আস্তে-আস্তে ছাত্রছাত্রীরা আর আমিও অভ্যস্ত হয়ে গেলাম—নিজেকে বেশ কেমন টেকনোলজিকালি আপডেটেড মনে হতে লাগল। কিন্তু ওইভাবে ক্লাস নিতে গিয়ে একটাই অসুবিধা। অনেকটাই বেশি সময় লাগে।

এই তো গেল আমার প্রফেশনাল লাইফের কথা। পার্সোনাল বা হোম ফ্রন্টের দিকে আমাদের সবাইকে একসাথে চব্বিশ ঘণ্টা কাটাতে হচ্ছে এখন—যেটা প্রায় হয়ই না! ওই বেড়াতে গেলে

কয়েকদিন বা রাতটুকু। রান্না করতে এমনিতে আমার খুব একটা খারাপ লাগে না, তাই এই সময়টায় অনেক নতুন-নতুন 'ডিসেস ট্রাই আউট' করছি। গান শুনছি, আর হ্যাঁ—প্রচুর ফিল্ম দেখছি, খুব একটা খারাপ লাগছে না।

কিন্তু তবুও এই যে বাড়ি থেকে বেরোতে পারছি না তা-তে নিজেকে কেমন যেন জেল-বন্দি আসামি মনে হচ্ছে। ক-দিন ধরে খুব স্বাধীনতার অভাব বোধ করছি যেন। আমার ফ্ল্যাটের ব্যালকনির সামনে নিমগাছটা দেখি, তাতে কত রকম পাখি আসে তাদের দেখি আর অভাবটা যেন আরও বেশি করে বুঝতে পারি। সব কিছু ওলট-পালট হয়ে গেছে—নইলে জ্যৈষ্ঠ মাসের ভর দুপুরবেলা কিনা 'কোকিলের কুহুতান' শুনতে পাচ্ছি!

কোনো কিছুই ঠিকঠাক হচ্ছে না, ঠিকঠাক চলছে না। একটাই আশা, সব ঠিক হয়ে যাবে, আবার আগের মতন জীবনকে স্বাধীনভাবে উপভোগ করতে পারব। মুক্তির স্বাদ ফিরে পাব।

মনামী সিংহরায় মুখার্জি
শিবপুর, হাওড়া

করোনা—এক নতুন চায়না মাল, নতুন এক রোগ, হাজির হল আমাদের জীবনে। লকডাউন—নতুন একটা শব্দ—নতুন ধরনের জীবনযাপন। চারদিকে হাজারো কৌতূহল, ভয় পাওয়া আর ভয় পাওয়ানোর কত মতামত , মত বিনিময়। হাজার ভাবনাচিন্তা, কিছু আগাম পরিকল্পনা বাতিল করে কিছু নতুন পরিকল্পনার খেলা শুরু মাথার মধ্যে—শুরুটা ছিল এমনই। বিশ্ব মহামারির সামনে আমরা—না , একে উপভোগ করব

এমন সদিচ্ছা কারও ছিল না, তবে অজানা অদেখাকে ভোগ করতে শুরু করলাম। সবাই ঘরে—ঘরমুখী হলাম আমরা। ভয় আতঙ্কের মধ্যেও মন্দ লাগল না।পরিবারের সবাই মিলে এত সময় একসঙ্গে কাটানোর এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা—নতুনের আস্বাদন, নিত্যনতুন রান্না—যা এত্ত দিন কিনে খেতাম তা আমার নিজের হাতে বানানো— কে না আনন্দ পায়!! স্কুল জীবনের পর আবার অফিস জীবনে গরমের ছুটি!!! না, এটা মনে মনে ভেবে নিয়েছিলাম। লুডো ঝেড়ে পরিষ্কার করে সন্ধেবেলায় তা নিয়েও বসেছি মেয়ে- বরের সঙ্গে। ব্যালকনির গাছগুলোর সঙ্গে এত্ত গল্প সময় ছিল নাকি! তা-ও করলাম। আশপাশের পাখিগুলোও বুঝি কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে, বাতাস আজ বেশ পরিশুদ্ধ, তাই তাদের কলতান, বকম-বকম, ছোটাছুটির মাত্রা বেড়ে গেছে।

আমার জানালার পাশে সক্কাল-সক্কাল বকমবকম করে এত্ত মিটিং মিছিল সমাবেশ চলছে যে আমার আর মোবাইলে অ্যালার্ম-এর প্রয়োজন হয় না। তারাই ডাক-হাঁক করে ঘুম ভাঙিয়ে দিচ্ছে। আবার ছোটোবেলার কিছু দৈনন্দিন অভ্যাস, যা মা এর হাত থেকে ছাড়া পাবার পর প্রায় ভুলতে বসেছিলাম তাকে আবার অত্যন্ত যত্ন করে শুরু—এমনই সব চলেছে করোনার করুণায়। সত্যি কথা বলতে কী মিশেলটা মন্দ নয়। তবে চারদিকের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হোক সর্বদাই এটা চাই—চেনা শহরটা বড্ড অচেনা হয়ে গেছে। যে কোলাহল, জ্যামজট এক সময় বিরক্তিকর ছিল—চারদিকের নিস্তব্ধতা কেন জানি না সেই বিরক্তি ছাপিয়ে মনের মধ্যে কষ্টের আঁচড় টানছে। জানি না কী আসছে সামনে, তবে আশাবাদী মন নিয়ে চলেছি ভালো কিছুর আশায় ।

প্রজ্ঞাপারমিতা কুণ্ডু
বহরমপুর

লকডাউন জীবনটাকে উলটে না-দিলেও পালটে দিয়েছে। আগে ঘুম থেকে উঠেই ছোটা শুরু হয়ে যেত। মেয়ের স্কুলের তাড়া, আমাদের অফিসে যাওয়ার তাড়া। পিক টাইমে জ্যাম-এর মধ্যে ড্রাইভ করা বা টিউব-এর ভিড় ঠেলে অফিস পৌঁছনো। তারপর সারাদিন পর একে অপরের মুখ দেখা। উইকএন্ড অবশ্য একদম আলাদা—বন্ধুদের বাড়ি যাওয়া, শপিং, বাইরে খাওয়া, নানারকম ইভেন্ট নিয়ে ব্যস্ততা ইত্যাদি। এখন আমাদের বাড়ি আর অফিস

দুটোই এক। সকালে অত আর তাড়া নেই । শান্তিতে ব্রেকফাস্ট করে যে যার ঘরে চলে যাই, অনলাইন স্কুল আর অনলাইন কাজে। এখন অনেক বেশি ফ্যামিলি টাইম। একসঙ্গে লাঞ্চ, ডিনার, পুস্টিকর বাড়ির খাবার খাও। উইকএন্ড-এ বন্ধুদের আর পরিবারের সঙ্গে জুম-চ্যাট করেই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো। তবে লাকিলি আমাদের একটা সুন্দর বাগান আছে, খুব সবুজ, অজস্র ফুলের আর ফলের গাছে ভরা। আমাদের ফ্রি-টাইম ওখানেই কাটে। বাগানের একটা আপেল গাছের ডাল থেকে দোলনা ঝোলানো আছে। সেখানে সকালে বসে নানান পাখির ডাক শুনতে বেশ লাগে। চারিদিক থেকে উদ্বেগের খবরে মনটা বিষণ্ন হলেও, কোথাও যেন একটা শান্তির সুর, একটা ভালো

লাগার আমেজ আছে, যেটা আমরা একসঙ্গে উপভোগ করি। আর অন্তর থেকে সকলের সুস্থতা কামনা করি।

বিদিশা দত্ত
লন্ডন

অন্তবিহীন পথে চলাই জীবন,
শুধু জীবনের কথা বলাই জীবন।

হঠাৎ যে এই অন্তবিহীন পথে এরকম একটা বাধাপ্রাপ্তি ঘটবে, সবার জীবনেই, তা কিন্তু স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি। এটাই আজ বাস্তব, এই অতি-মহামারি স্বাভাবিক জীবনের ছন্দপতন ঘটিয়েছে, নতুন স্বপ্ন কিন্তু এই মুহূর্তে আর আসছে না। শুধুমাত্র মানুষের জন্য প্রতিদিনের সুস্থতা কামনা করে চলেছি।

এই লকডাউন বা গৃহবন্দি হওয়ার আগের দিনগুলো আমার কাছে ছিল ভীষণ প্রাণবন্ত। খুব ছোটো করে যদি নিজের পরিচয় দিই, আমি শর্মি, গান-বাজনা নিয়ে জীবনযাপন করি, ছোটোবেলা কেটেছে হুগলি জেলার মফস্‌সল কোন্নগর-এ। বর্তমানে আমি লন্ডন নিবাসী, অবশ্য সেটা স্বামীর চাকরির সুবাদে। যেহেতু আমি একজন সংগীত-শিক্ষিকা, দিনের বেশিরভাগ সময়টাই কাটত ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে; অথবা নিজের সাংগীতিক অনুষ্ঠান কিংবা তার মহড়া নিয়ে। কিন্তু এই মুহূর্তে পরিস্থিতির চাপে হয়তো চলছে সবই, তবে ভার্চুয়ালি। ছাত্রছাত্রীরা গান শিখছে স্কাইপ-এ, সবাই মিলে হই-হুল্লোড় গানবাজনা আর হচ্ছে না। কবে আবার স্টেজ-শো করব তারও কোনো নির্দিষ্ট দিন বা সময় আমাদের

জানা নেই। মঞ্চে প্রবেশ করার পরেই স্পটলাইট, মানুষের করতালিতে আন্তরিক অভ্যর্থনা পাওয়ার সেই দিনগুলো হঠাৎ করেই কেমন যেন বদলে গেল! যদিও তার পরিবর্তে এখন জীবনে এসেছে ফেসবুক লাইভ, অনেক গুণী শিল্পী প্রণম্য মানুষের অনুষ্ঠান ঘরে বসে দেখছি-শুনছি। মাঝেমাঝে নিজেও করছি, কিন্তু এইসময়ে ভীষণভাবে একটা উপলব্ধি হয়েছে প্রকৃতি হয়তো অতিরিক্ত কঠোরভাবে সবাইকে শিক্ষা দিল—কত নগণ্য আমরা, বৃথাই বড়াই করি নিজেদের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মনে করে। অথচ একটা অদৃশ্য ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতাটুকুও নেই আমাদের।

তবে প্রকৃতি আজ দূষণমুক্ত। বহু পাখির কলকাকলি ভেসে আসে কানে প্রতিনিয়ত। যে লন্ডনে প্রতিদিন বৃষ্টি হত, সেই লন্ডনে আজ ঝলমলে রোদ—চিরবসন্ত বিরাজ করছে যেন। প্রকৃতি একেবারে নতুন সাজে সজ্জিত। জানলা দিয়ে যখন ঝকঝকে নীল আকাশটাকে যখন দেখি, একটা আশা যেন দেখি, সেই নচিদার গান ভেসে আসে মনে—

একদিন ঝড় থেমে যাবে
পৃথিবী আবার শান্ত হবে।

শর্মি গাঙ্গুলি
লন্ডন

আমি শিঞ্জিনী, বয়স ৩২, চাকুরিরতা। আমার একটা তিন বছরের ছোট্ট মেয়ে আছে, গুনগুন। চাকরিসূত্রে আমার বর সৈকত বিদেশে থাকে, তাই আমি আর আমার মেয়ে, এই নিয়েই আমার সংসার। লকডাউনের আগে এবং পরে সবার মতো আমার জীবনেও অনেক পার্থক্য এসেছে।

লকডাউনের আগে আমার জীবন চলত ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে। সকালে ঘুম থেকে উঠে ঘরের কাজ সেরে, মেয়েকে তুলে,

খাইয়ে, তাকে তৈরি করে, নিজে তৈরি হয়ে, তাকে প্লে-স্কুলে পৌঁছে দিয়ে, তারপর নিজে অফিস যেতাম। আবার সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে মেয়ের সঙ্গে খেলে, রান্না করে, খাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে তবে আমার দিন শেষ হত। একা সংসারে সময় যেন ঘোড়ায় চড়ে দৌড়ত। কোন একটা কাজে বেশি সময় লেগে গেলে অন্য কাজ কেটে-ছেঁটে সেটা আমাকে পূরণ করতে হত। এতই মাপা ছিল আমার সময়। এই ব্যস্ততার মধ্যেও মেয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল খুব ভালো, সেই ছিল আমার বন্ধু, যার সাথে আমি ওর মতো করে গল্প করতাম। মেয়ে ছিল আমার সাহায্যকারী, সে তার মতো করে আমার সব কাজে সাহায্য করত। কিন্তু তার মধ্যে কোথাও একটা খারাপলাগা ছিল। মেয়ে যেন বড্ড তাড়াতাড়ি বড়ো হয়ে যাচ্ছিল, আর আমি আমার দৌড়ানোর মাঝে সেটা হারিয়ে ফেলেছিলাম।

তারপর ২০১৯ এর ডিসেম্বর মাসে হঠাৎ ঠিক করলাম কদিন সৈকতের ওখানে ছুটি কাটিয়ে আসি। আসলে গুনগুন তার বাবাকে সেভাবে দেখেনি—বাবা যে কী, সেটা ও ঠিক বোঝে না। ২০২০-তে ওর বড়ো স্কুলে যাওয়ার কথা ছিল।

এরপরে আর সুযোগ আসবে কিনা জানি না, তাই হঠাৎ করেই চলে এলাম ইউনাইটেড স্টেটসে। আমার লকডাউনের সময়টা তাই অন্যদের থেকে হয়তো অনেকটাই আলাদা। আমি এখানে একটা ছোট্ট স্টেট, ইউটা-তে থাকি। এই জায়গাটায় পাহাড়ের একদম মাথায় আমরা থাকি। সমুদ্রতল থেকে অনেক উঁচুতে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর আমার এই বাড়ির চারিদিক। রোজ আকাশ যেন নতুন-নতুন রঙে ভরে ওঠে। বাস করবার নয়, বেড়াতে আসার জায়গা যেন! আরও ভালো লাগে তার কারণ, এখন এসব উপভোগ করার মতো আমার কাছে অনেক সময় আছে। এখানে আসার সময় কলকাতায় আমার প্রতিদিন পরার ঘড়িটা তাড়াহুড়োয় ফেলে এসেছি। কিন্তু ঘড়ি ফেলে আসায় আমার সময়টাই যে আটকে যাবে, সেটা বুঝতে পারিনি। এখানে ফেব্রুয়ারির শুরুতেই লকডাউন হয়ে গেল, তাই আর বাড়ি ফেরা হল না। আর আমার জীবনটাও অনেক পালটে গেল।

আমাদের বিয়ে হয়েছে পাঁচ বছর, ২০১৫-তে। কিছুদিন পরেই সৈকত বিদেশে চলে আসে। দীর্ঘদিন একা থাকার ফলে সম্পর্কেও একটু একটু ফাটল ধরছিল হয়তো, কিন্তু লকডাউনের ফলে সে-ফাটল জুড়ে গিয়ে সম্পর্কের ভিত আবার কিছুটা শক্ত হয়েছে বলা যায়। আর একটা মজার ঘটনা হলো ২০১৫-র বিয়ের তারিখের পর, এই প্রথম আমরা ওই দিনটা একসঙ্গে কাটাতে পারলাম, সেটা লকডাউনের সৌজন্যে। আমার থেকেও বেশি পরিবর্তন হয়েছে গুনগুনের জীবনে। আজ ওকে আর আমার ঘড়ির কাঁটা ধরে ছুটতে হয় না। এখন আমরা ঘুম থেকে উঠলে সকাল, ঘুমোতে গেলে রাত্রি। চব্বিশ ঘণ্টাই কাটে

বাড়িতে। অফিস বন্ধ হওয়ায় সে তার বাবাকেও একটু একটু করে চিনছে। আমার মেয়ে তার ছোট্ট মাথায় নিজের মতো করে বুঝে নিয়েছিল, মা ছাড়া তার বোধহয় আর কেউ নেই। তাই লোকে যখন প্রশ্ন করত, "তোমাকে কে কে ভালোবাসে?" 'মা' ছাড়া ও আর কোনো উত্তর খুঁজে পেত না। এখন ও বুঝতে শিখছে মা ছাড়াও আরও একজন আছে—তার নাম বাবা। লকডাউনে হঠাৎ করে আটকে না-গেলে, এটা ওকে কবে বোঝাতে পারতাম বা আদৌ কোনোদিন বোঝাতে পারতাম কিনা আমি জানি না। লকডাউনে এটা আমার এক বিরাট প্রাপ্তি।

আরও একটা প্রাপ্তি আছে যেটা সম্পূর্ণভাবে আমার। আগে আমার মেয়ে এমন অনেক কিছুই শিখছিল যা সময়ের অভাবে রয়ে যেত আমার চোখের বাইরে। ওর বড়ো হওয়াটা ঠিক চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম না। এখন আমার অফুরন্ত সময়। আমি রোজ দেখি ও একটু-একটু করে বড়ো হচ্ছে। ওর বলা প্রতিটা নতুন শব্দ এখন আমি প্রথম শুনি। ওর অনেক কিছুই প্রথম করা আমার হাত ধরে। চোখের সামনে নিজের মেয়েকে একটু একটু করে বড়ো হতে দেখার মধ্যে একটা আলাদা আনন্দ আছে, যেটা

থেকে আমি বঞ্চিত ছিলাম কিছুটা, সেটা লকডাউন আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে—ওই আমার লকডাউনের পাখি।

লকডাউন হওয়ার কারণটা এতটাই খারাপ প্রত্যেকদিন সবার মতো আমিও খবরে খোঁজ করি আবার সব কবে নর্মাল হয়ে যাবে, এই সময়টা বোধহয় সবার জীবনে একটা দুঃস্বপ্ন। কিন্তু কেমন করে যেন আশ্চর্যভাবে এই ২০২০ সালটা এখনো আমার স্বপ্নের মতো কাটছে। এরকম দিন যে আসতে পারে, তার স্বপ্ন আমি কোনোদিন দেখিনি। কিন্তু আমি সেই স্বপ্নে এখন বেঁচে আছি। দমদমের গলির ভেতরে দু-কামরার ফ্ল্যাটে লকডাউন হওয়ার চেয়ে এই প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের মাঝে পাহাড়ের কোলে লকডাউন হওয়াটা সত্যি স্বপ্ন। যদিও এখন মাঝে-মাঝে আমার মেয়ে জিজ্ঞেস করে, "এটা তো বাবার বাড়ি, আমাদের বাড়ি কবে যাব? ভালো ভালো জামাগুলো তো আলমারিতে রয়ে গেল! সেই তিনটে প্লেন আবার কবে আসবে, যেটা করে এসেছিলাম বাবার কাছে?" ও যেমন প্লেন ফিরে আসার আশায় আছে, আমারও তেমনি মাঝে-মাঝে মনে হয়—শুধু আমি স্বপ্নে বাঁচলে তো হবে না! বাকিদেরও দুঃস্বপ্ন কেটে গিয়ে আবার যেন সবাই সুস্থভাবে নিজের জীবনে ফিরে যেতে পারে, সেই আশায় বুক বাঁধছি এখন।

শিঞ্জিনী পাল
ইউটা, ইউনাইটেড স্টেটস

বুকে বালিশ চেপে উপুড় হয়ে বই পড়া পুরানো বদভ্যাস। পায়চারি করতে-করতে পাতার-পর-পাতা উলটে যাওয়াও নতুন কিছু নয়। কিন্তু, যেইসব দিনে কোটি মানুষের পৃথিবীতে আমাদের নিজেদের সবচেয়ে একা লাগে, তখন বৃদ্ধ হয়ে আসা আকাশটা অন্ধকারে ডুবতে করে সাহায্য। আলোতে অস্বস্তি হয়। ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসা ঘোলাটে পৃথিবীতে নিজেকে মনে হয় বৃত্তবন্দি।

বিখ্যাত ‘কিভাহান’ থেকে ‘পেনি ইউনিভার্সিটি’র নাম উজ্জ্বল রাখতে ঘরবন্দি দিনে কড়া কফি যেন নিঃসঙ্গতার সঙ্গী। মানসিক অবসাদের হাত ধরে; শেয়ার করা জিফ কিংবা জিরাফের মতো আকাশের দিকে মুখ উঁচু থাকলে বেনামি বাতাসের মতো, অদ্ভুত এক শূন্যতা ছেয়ে যায় মনে। দেয়ালে ঝিমায় লালন, নজরুল, জন লেনন। বাইরে উইন্ড চাইম সিক্রেট কনফেশনের মতো মৃদু শব্দ তোলে। মোবাইলে মেলানকোলিক ওয়েদার ফোরকাস্ট, মেঝেতে কিছুদিন আগে কেনা শুকনা গ্রোসারি, পুরানো ম্যাগাজিন, স্প্যানিশ গিটার, টেবিলে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা ইয়ারফোন, আধখোলা বই ও বুকমার্ক। সারাদিন অভুক্ত থাকার পর সন্ধ্যার খাবারটুকু খেয়ে, কাউচে চোখ বুজে আনরিড

অপশনে ক্লিক করলে, কোনো এক এ্যালবাম আর্টের টুকরো ছবি প্রবল ইলুশন আনে। যেন চলন্ত গাড়ি থেকে কেউ হ্যাঁচকা টানে এনে দাঁড় করিয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরানো, রহস্যময় বনভূমির চাইতেও গহিন অরণ্যের সামনে।

তারপর মনে হয়, 'মহামারি' এ শব্দটি যেন প্রতি শতকে নতুন করে মানব সভ্যতাকে একটি সীমাবদ্ধতা ও নানা প্রশ্নের সম্মুখীন করে এসেছে। সাবধানী ঘাতকের মতো আসা এশিয়ান ফ্লু, এইডস, বার্ড ফ্লু, কলেরা, প্লেগ প্রতিবার শক্তমুখে হাতে ধরিয়ে দিয়েছে লিমিটেড ব্র্যাকেটের নিয়মাবলি। ওটুকুর মাঝেই হবে বাঁচতে। অভ্যস্ত হতে হবে গল্প, উপন্যাস কিংবা তথ্যচিত্র থেকে জেনে আসা দুঃস্বপ্নে। যে-দুঃস্বপ্নের কথা বারবার উঠে

এসেছে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে হালের মার্গারেট অ্যাটউডের লেখায়। কভিড-১৯ ও এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। একবিংশ শতাব্দীর এ ঘাতক আমাদের করতলে তুলে দিয়েছে কোয়ারেন্টাইন, লকডাউন, স্টে হোম অর্ডারের মতো নতুন সব শব্দ। আর আমরা অপেক্ষা করছি অন্ধকারের হাতছানি কাটিয়ে আলোর উষ্ণতা ছুঁয়ে দিতে। কিন্তু এ যুগে যে যার ঘামাচি নিয়ে ব্যস্ত দুনিয়ায় এত সহজে নিস্তার কোথায়? তাই সর্বত্র চলে দাঙ্গা, কারফিউ আর সীমিত পরিসরে হৃদয় ক্ষরণ।

তবুও সকল বায়ু দূষণ ছাপিয়ে আকাশ ঝকঝকে, সহজে দেখা যায় দূরের তারা। নগরের ধুলোয় ধূসরিত থাকা সব গাছের পাতার রং এখন সবুজ, সূর্য জেগে উঠলেই অনর্গল পাখি ডাকে নির্ভয়ে। লাফিয়ে বেড়ানো ডলফিন আর নানা মাছদের মেলায় সমুদ্রের জল গাঢ় নীল। নির্জন রাজপথে নাচে ময়ূর, সন্ধ্যায় কান পাতলেই কোরাস গায় ঝিঁঝিঁ পোকা। যেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম

সৃষ্টিদের কোনো প্রয়োজন পৃথিবীর নেই। ছিল না কখনও। আর গৃহবন্দি অবরুদ্ধ জীবনে থেকে আমরা একটু হলেও বুঝতে পারি নিজেদের শ্রেষ্ঠ দাবি করা মানুষ প্রকৃতির কাছে কত ক্ষুদ্র। এইসব ভেবে চার দেয়ালে ঘুরে বেড়াই বোকা বাক্সে আটকে থাকা প্রাণীর মতো। তবে আশার কথা, এত কিছুর পরেও আলেয়ার অপেক্ষায় প্রহর গুনি, খাই-দাই, গান শুনি, হাতে বই, মুখে এলাচ বাগান, স্মৃতির বড়শিতে মাছ। ভাবি, একদিন সব ঠিক হয়ে গেলে নতুন করে বাঁচব। তবুও পাতার পর পাতা থেকে যায় চিহ্নহীন। ভেতরে চলে দহন, খাঁচাবন্দি পাখির মতো ছটফট করি।

কেন? কীসের আশায় জানালার পর্দা সরিয়ে বাড়িয়ে দেই মুখ? সত্যি বলতে, আজও তো কেউ জানে না, কতটুকু পথ পাড়ি দিলে পথিক হওয়া যায়, কতদিন পর আসবে মুক্তি? যেখানে হৃদয় ছড়িয়ে ভালোবাসা দেওয়ার কথা আমরা সেখানে বিভেদ টানি। হোই বেয়ারা, আত্মকেন্দ্রিক। তবুও নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকা এই সময়ে দিনশেষে এটাই কামনা, এই বেঁচে থাকার সংকট যেন আমাদের নতুন করে ভালবাসতে শেখায়। আমরা যেন এমন পৃথিবী সৃষ্টি করতে পারি যেখানে হাজারও আলো জ্বালিয়ে যাবে মানব হৃদয়।

মাহরীন ফেরদৌস
উইচিতা, ক্যানসাস, ইউনাইটেড স্টেটস

মাস ছয়েক আগে, একদিন সকালে বাড়ির কার্নিশ থেকে পায়রার বক বকম প্রথম কানে এলো। মনটা অদ্ভুত ভালো লাগায় ভরে গেল। আমাদের আশেপাশে উপস্থিত নানা পশু এবং পাখি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'সহজে সে ভৃত্য তব বন্ধনবিহীন'। তারা সত্যিই আমাদের দৈনন্দিন সঙ্গী। তাই এদের হঠাৎ অনুপস্থিতি মনের কোণে কোথাও একটা অভাববোধ তৈরি করে। আমাদের বাড়ির পাশে বড়ো-বড়ো পুরোনো গাছে ঘেরা,

একটা পুকুর আছে। সেখানটা বছর দশেক আগেও প্রচুর পাখির কলকাকলিতে ভরে থাকত। মোবাইল টাওয়ার বা অন্য কোনো অজানা কারণে ক্রমে পাখির সংখ্যা কমে যেতে শুরু করল। তারপর এক সময়ে কাক ছাড়া তেমন কোনো পাখি আর চোখে পড়ত না। লকডাউনের পর ধীরে-ধীরে চড়াই, শালিক, হাঁড়িচাচা প্রভৃতি পাখির সংখ্যা বাড়ছিল। কিন্তু ভয়ংকর 'আমফান' এসে চারিদিক তছনছ করে দিয়ে গেল। সে পাখিরা তো বটেই, পায়রাগুলোও কোথায় যেন চলে গেল। দুঃখের মাঝে মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের সান্ত্বনা, 'যতক্ষণ আমাদের সেই বেদনাবোধ আছে ততক্ষণ আমাদের আশা আছে।'

আমার পৈতৃক বাড়ি বাংলাদেশের চাঁপাই নবাবগঞ্জে। সে-বাড়িতে আদ্যিকাল থেকেই প্রচুর পায়রা রয়েছে। তাদের থাকার জন্য গোয়ালবাড়ির ছাদের নীচে বাঁশ ও চাটাই দিয়ে মাচা তৈরি করা আছে। সকালবেলা তাদের জন্য ধান ছড়িয়ে দেওয়া হলে পুরো উঠোনটা পায়রায় ভরে যায়। বাড়িতে আরও নানা পশুপাখি ছিল। তাদের মধ্যে স্বভাবগত শত্রুতা থাকলেও, বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে তা ভুলে থাকতে পারলেই এ বাড়িতে থাকা যাবে। তাই বেড়াল ও পাখিদের সহাবস্থান ছিল, পায়রাদের নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াতে দেখতাম। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হয়। দিনে দিনে পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে ওঠায়, দাদু সপরিবারে চলে এলেন কলকাতায়। সেই

সুযোগে দরজা-জানালাসহ বাড়ির সমস্ত জিনিস অন্যরা কুক্ষিগত করে নেয়। পশুপাখিগুলোও কেমন হারিয়ে যায়। দীর্ঘ ন-মাস যুদ্ধের পর দেশ স্বাধীন হল। দাদু ও বাবা দেশে ফিরে গিয়ে বাড়ির মেরামতির কাজ শুরু করালেন। একদিন দাদু দেখেন, বাড়ির পাশেই কাঁঠাল গাছে একটা পায়রা এসে বসে আছে। কিছুক্ষণ থেকে সে চলে গেল। পরদিন দুটো পায়রা এলো, আবার অল্প সময় বাদে চলে গেল। তারপর দিন একইভাবে একসঙ্গে চারটে পায়রা এসে আবার ফিরে গেল। পরবর্তী চারদিন কোনো পায়রার দেখা মিলল না। পঞ্চম দিনে এক ঝাঁক পায়রা এসে বাড়ির ছাদ-কার্নিশ-উঠোন ভরিয়ে দিল। সেই থেকে তারা বাড়িতে রয়ে গেল।

যে-পায়রাদের আলাদা কোনো কদর ছিল না, এই অপ্রত্যাশিত আনুগত্যে তারা সবার মনে গুরুত্ব আদায় করে নিল। সেই নজির আবার ফিরে এল এই জীবনে।আজ সকালে এ বাড়ির আলসে থেকে শুনতে পেলাম ফিরে আসা পায়রাদের বক বকম।

কৌশিকী বসু
বোসপুকুর, কলকাতা

আমি তো দেখতাম জানলা দিয়ে। কখনো বিয়েতে দেবু ঠাকুরপোর কাছ থেকে পাওয়া বায়নোকুলারটা দিয়ে। অজস্র পাখি, প্রজাপতি, ভোমরা, ফড়িং দেখা যেত। বৃষ্টির আগে একরকম, পরে একরকম। আমার রেনফরেস্ট ক্যানোপির মতো স্বপ্ন-স্বপ্ন লাগতে। এত ঘন নীলচে কালো সবুজ। চিলেকুঠুরির জানলা দিয়ে পাশের পাশের মেজো ছোটো ছাদ পেরিয়ে, সরু গলির গায়ে, আইটিআই-এর পাঁচিলের পাশেই। সারাবছরই

ঘন সবুজ, আর গরম জোরদার পড়লেই মুকুটের মতো শিষ। গরমের ছুটি পড়তে-না-পড়তেই হলুদ ফুলের বন্যা। খেয়াল করে দেখেছি, শহরের লাল ফুরিয়ে আসতে-না-আসতেই হলুদ শুরু হবে। সোঁদাল, স্বর্ণচূড়া নাকি রাধাচূড়া। এটা ওই ঝুরঝুরে হলুদ ফুলের গাছ যার তলায় যত ঝরে গাছের মাথায় তার চেয়েও বেশি ফুটবে। তারপর গরমের শেষে আরেক বাহার। তামা রঙের সিমের মতো ফলে সাজবে গাছ। অনেকদিন। এত ঘন পাতা বলেই কত পাখি। কোকিল তো ঝালাপালা করেই দিনে রাতে যখন তখন; দোয়েলটা ভোর জানায় একরকম শিষ দিয়ে, বিকেলে অন্য। নীল গলার ভরতপাখির কুক কুক, হাড়িচাচার চ্যাঁ-চ্যাঁ, বুলবুলের ঝটাপটি, টুনটুনির তুড়ুক লাফানো,

এইসব নিয়ে জমজমাট। পাশের বাগানের আমগাছটা ওদের পার্কের মতো ছিল। উড়ে এসে বসতে কখনও-কখনও। কালো মাথা হলুদ বেনেবউটাও। কখন কে আসবে মুখস্ত ছিল। আম গাছটা মানুষে কাটলে। জানতাম না, রিপোর্ট করা যায়। সে গেল। তা-তে করে ইনি আরেও স্পষ্ট হলেন। তবু ওই ঝুপসি গাছটা ছিল একাই একশো হয়ে। আমফানের ঝড় হল সারা সন্ধে। বিশাল আওয়াজ করে ঝড়। পরদিন ভোরে উঠেই দোয়েলটার ডাক না-শুনে ভয়ে-ভয়ে ছাদে গেলাম। নেই। সেই ছাতার মতো সবুজরা বিলকুল নেই। শুধু আকাশ। ছাইরঙের, বিবর্ণ। সারাদিনে কোকিলের ঝাপটানি-ও নেই। শুধু দু-একটা কাক কোথায় বসবে ভেবে উড়ছে। সারাদিন অপেক্ষা করলাম, তার পর-পর কয়েকটা দিন আরও। নিশ্চুপ সব। অন্যান্য বিকেলেও দোয়েল পাখি আর পাখিবউ আসেনি।

পিয়ালী বন্দ্যোপাধ্যায়
টালিগঞ্জ, কলকাতা

‘বিহগ’ শব্দটি আমার বড় প্রিয়। ‘বিহায়স’ মানে আ...কা...শ, ওই আকাশে গমন করে যে। এই ক্রান্তিকালে অনন্ত আকাশে পাখির ওই অনায়স বিচরণ আমাকে মুগ্ধ করে... আমি কান পেতে শুনি ওদের পরস্পরের কথা। আমার চারিদিকে ভাসে ওদের ডানার ঘ্রাণ। তারপর অস্তগামী সূর্যের দিকে যখন ওরা চলে যায় আমি বিষন্ন হই। আমার মনে পড়ে যায় একদিন এ পৃথিবীর মাটিতে আমারও ছিল নিরঙ্কুশ, নির্ভয় পদচারণা!

ঘরবন্দি থাকতে-থাকতে মনে হয় আমার অবস্থা রবিঠাকুরের সেই খাঁচাবন্দি থাকা পাখিটার মতো হবে না তো! বন্দিজীবন যার ওড়ার শক্তিকে কেড়ে নিয়েছিল!

ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ল কল্যাণী দত্তের লেখা *পিঞ্জরে বসিয়া* বইটার কথা... ইন্দুমতীর কথা। ওই বইয়ে আরও একটি পাঁচ-ছ-বছরের বিধবা মেয়ের কথা ছিল। তার মা রান্নাঘরের এককোণে বসে তাকে ভাত মেখে যখন খাওয়াচ্ছিল তখন দূরে বসে মাছ-ভাত খাওয়া ভাই জিজ্ঞেস করল— "তোর

মাছ নেই"। মেয়ে মাকে প্রশ্ন করলে মা ডালের বড়া দেখিয়ে বলল "এই তো তোমার মাছ"। মেয়েটি তা-তেই খুব খুশি—এ ছলনা বোঝার মতো বয়স তখন তার ছিল না, আর যখন বয়স হল, তখন মা-কে এ প্রশ্ন করে সে আর বিব্রত করেনি। ভাবি সেই সমস্ত মেয়েদের কথা যারা আজীবন কাল থেকে যায় ঘরবন্দি, যাদের জীবনে 'পাখি হওয়া' আকাশকুসুম কল্পনা মাত্র!

তাই আমি আমার 'মন পাখি'-কে উড়তে দিই এক মুক্ত আকাশে, যদিও ডানা ভাঙে প্রতিকূল পরিতিতে তবুও সেই অসহায় সৈনিক যার কাছে "হেরে যাবার আগে হেরে যাওয়া নয়" (এই লেখাটা আমার ক্যান্সারে মৃতা বন্ধুর দেওয়ালে লেখা ছিল) তার মতো করে ভাবি আর রবি ঠাকুরের লেখা ধার করে বলি—

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ্র মন্থরে,
সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে,
দিক্-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা—
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

সৃজনী সাধুখাঁ লাহিড়ী
ব্যান্ডেল, হুগলি

তবুও সকাল আসে।

ফুল পাখি নতুন ওঠা সূর্য এসব দেখতে দেখতে মৃতের তালিকা ভুলে যাই।

ভুলে যাই স্বাস্থ্যবিধি,বেঁচে থাকার নিয়ম কানুন।

একটা একঘেয়ে দুপুর,একলা বিকেল,বিষন্ন রাতের জন্য কত ঝলমলে প্রস্তুতি!

হাউ গ্লোরিয়াস এ মর্নিং ক্যান বি!!!

একজোড়া বুলবুলি। গোটা কতক ছাতারে। একটা মৌটুসি। একটা দোয়েল। আর কয়েকটা চড়াই মিলে এত কিচিরমিচিরও করতে পারে!! আমার বায়োলজিক্যাল অ্যালার্ম ক্লক!

সবচেয়ে চিকন গলা বুলবুলি জোড়ার।

কেন ডাকিস রে পাখি?

দূষণ কমে গেছে বলে? নাকি চিড়িয়াখানায় বন্দি মানুষ দেখে আহ্লাদে আটখানা?

ওহ! বাসা বাঁধবি? তাই এত ফুর্তি? বেশ বেশ...গাছ পছন্দ হয়। ডাল। বেশ বড়ো-বড়ো পাতার আড়াল। পুরুষ সিপাইটি সারাদিন খাটে। গরবিনি সঙ্গিনী ঘাড় বেঁকিয়ে-বেঁকিয়ে দেখতেই

থাকে। দেখতেই থাকে। দিব্য বাসা হল। বেশ গোল বাটির মতন। সিন্থেটিক তুলোর ফেঁসো দিয়ে গদি। লতাপাতার ডেকরেশন। ঘর পছন্দ হয়। বিবি দিব্য জাঁকিয়ে বসেন। পুরুষটি আশেপাশেই থাকে। পোকাটোকা ধরে আনে। আমার খাঁচায় বসে ভাগাভাগি করে খায় দু-টিতে।

প্রথমে দুটো তারপর তিনটে। ঘিয়ে আর বাদামিতে প্রিন্টেড। ডিম দেখে বাবার মায়ের ভারি ফূর্তি। এক পাক দুজনে ডানা মেলে উড়ে গিয়ে বসে নারকেল গাছের ডগায়। তারপর টেলিফোনের তারে। দোল খায়। ফের মা এসে বসে। ডিম ফুটে তিনটে হতকুৎসিত ছানা বেরোয়। কালচিটে চামড়া।

রোমের ছিঁটেফোটা নেই। চোখ ফোটেনি। আছে কেবল লাল-লাল হাঁ করা মুখ আর বিশ্বগ্রাসী অনন্ত ক্ষুধা। বাবার কাজ বাড়ে। পাঁচজনের খাবার তার ছোট্টোদুটো ডানায়,ঘাড়ে। সারাদিন পোকা আনতেই থাকে। স্বামীসোহাগিনী সন্তান-গরবিনি মা জননী এসে খেতে বসেন। বাবা কেমন করে যেন ওদের খাওয়াতে থাকে।

কাজ বেড়েছে আমারও। ছাদবাগানের দরজা খুলে পাহারায় থাকি। বড়ো-বড়ো কাক জুটেছে। ইয়া লাল শক্ত ঠোঁট। দেখলেই পাখি হুস। পাখি হুস। কাক যায় না। এ দু-টিতে ফুরুৎ করে পালায়। একটা কিম্ভুত না-বেড়াল না-বেজি প্রাণী দেখেছি। ধূমকেতুর মতন ঝাঁকড়ানো ন্যাজ। ভাম নাকি! সেলিনা বলল, 'সোঁড়েল'। লক ডাউনে রাস্তার কুকুরদের খাওয়ানোর রেওয়াজ। বেড়ালগুলো মনে হয় দুর্ভিক্ষপীড়িত। সারাক্ষণ দেওয়ালে হাঁটে।

সানসেটে বসে। থাবা চাটে। নখে শান দেয়। চারদিকে মৃত্যু যেন ওঁত পেতে আছে।

দম্পতির এসবে পরোয়া নেই। সদ্য চোখ ফোটা বাচ্চাগুলো একটু ভালো হয়েছে দেখতে। মাল্টিভিটামিন খেয়ে হয়তো! সারাদিন খাচ্ছে আর খাচ্ছে।

গুমোট বিকেল। ঝড় নেমে আসা সন্ধ্যা। ঝুম বৃষ্টির রাত। এসি-বিহীন মধ্য মে-র রাতে ফেব্রুয়ারির মতন আরামে কাঁথামুড়ি ঘুম ভাঙল এক থমথমে নীরব সকালে। কী যেন নেই। ওহো বেলা হয়ে গেছে। পাখিরা ডেকে-ডেকে চলে গেছে। দরজা খুলে বেরোই। আমার খাঁচা-ছাদটা কেমন ফাঁকা-ফাঁকা। জবাগাছটা দেখে মনে হয় সর্বজয়ার মুঠিতে উঠে গেছে দুর্গার দু-গাছি চুল। পাতার আড়াল খসে গেছে। নীচে পড়ে আছে ওলটানো থ্যাঁতলানো ভেজা বাসাটি। মা বাবা বাচ্ছারা গায়েব।

খাঁচাশূন্য করে পাখিরা আমার পাড়ি দিয়েছে অনন্ত আকাশে। লকডাউনের পাখিরা আইসোলেশন ভেঙে সোস্যাল ডিসট্যান্স না-রেখেই উড়ে গেছে দূরে কোথাও। অন্য কোনোখানে।

এমন সকাল ও আসে! তাকে আসতেই হয়।

হাউ গ্লোরিয়াস এ মর্নিং কুড বি!!!

হাউ বিটার এ মর্নিং ক্যান বি!!!

সুচরিতা চক্রবর্তী
রানাঘাট, নদিয়া

‘কোতাও আমার হারিয়ে যাওয়াল নেই মানা মুনে মুনে’... ঠিকমতো বুলি ফোটার আগে থেকে এই গানটা নাকি আউরে চলতাম, মা বলে। বড়ো হওয়ার পরেও গানের কথাটা যে মনের এত কাছাকাছি সেটা বুঝতে অনেক সময় লেগেছিল। অবশ্য বরাবরই ঘরকুনো বদনাম আছে আমার। বাইরে বেরোনোর বদলে ঘরে থাকতে স্বচ্ছন্দ বোধ করি বেশি। তবে একটুকরো আকাশ তো লাগেই, নইলে মানুষ বাঁচে কী নিয়ে!

আগে যে বাড়িতে থাকতাম সেটা ছিল টপ-ফ্লোরে। আকাশ একেবারে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ত আমার অন্দরে। আর ছিল পাখি। একেক জানলা দিয়ে দেখা যেত একেক রকম পাখি। কত রকম—নাইট হেরন, শামুকখোল, পানকৌড়ি। এছাড়া তো ছিলই কাক, পায়রা, চড়াই, শালিকেরা। নাইট-হেরনগুলো হেঁড়ে গলায় ডেকে চলত সারারাত ধরে। যত রাত বাড়ত তত ওদের কর্মব্যস্ততাও বাড়ত। বাড়ত স্বজাতির সাথে ঝগড়ার বহড়। প্রত্যেক বছর নির্দিষ্ট সময় আমার ফ্ল্যাটের সামনের রাধাচূড়া গাছটায় বাসা বাঁধত ওরা। প্রচণ্ড গরমে মা হেরন আগলে রাখত সদ্য ফোটা ছানাগুলোকে। আর বাবা জোগান দিত মাছের। প্রতি

বছর একই গাছের একই ডালে বাসা বাঁধত কয়েকটি দম্পতি। আর আমি ডিম ফোটা থেকে সদ্য হওয়া বাচ্চাগুলোর উড়তে শেখা পর্যন্ত দেখতাম দুরুদুরু বুকে। ঝড় উঠলে জানলা ফাঁক করে দেখতাম ওরা ঠিক আছে কিনা। নাইট হেরনের বাচ্চাগুলো যখন হত তখন তাদের গায়ের রং হত বাদামি, তা-তে কালো কালো দাগ। ধীরে-ধীরে তারা বড়ো হত ডানা হত। তাদের রং পরিবর্তিত হত সাদা আর ধূসরে। মাথার উপর লম্বা একটা ঝুঁটি।

আর ছিল শামুকখোল। তাদের সব সময় দেখা যেত না। তারা আসত বসন্তকালে, রাধাচূড়া যখন কচি ডাল পাতায় ভরে উঠত তখন। বিশাল-বিশাল সাদা শামুকখোল তাদের বিরাট বিরাট সাদা ডানা, তা-তে একধারে কালো বর্ডার, ইয়া লম্বা ঠোঁট, দেখে মনে হত পাখিদের রাজা। সূর্যের আলোয় তাদের রূপে চোখ ঝলসে যেত। ডানা মেলে উড়ে এসে বসত গাছগুলির একদম উপরে। সুনিপুণ দক্ষতায় ঠোঁটের ডগায় ছিঁড়ে নিত গাছের সব থেকে কচি পাতাসহ ডালগুলিকে। তাদের সোনাদের জন্য বেছে বেছে কচি নরম ডাল দিয়ে তৈরি হবে বাসা। আমার দেখে মনে হতো এত যত্ন করে এত আরামের বিছানাটি প্রস্তুত হচ্ছে রাজপুত্র রাজকন্যাদের জন্য। যেমন তাদের রূপ যেমন তাদের ব্যক্তিত্ব। এমন বিছানা ওদেরই মানায়। আমি সারা বছর অপেক্ষা করতাম এই শামুকখোলদের দেখার জন্য। বছরে এক-দু-বারই তাদের দেখা যেত। তারা উড়ে আসত কোনো এক রূপকথার দেশ থেকে সঠিক উপকরণের খোঁজে। আবার ফিরে যেত সেখানেই। চাইলেও আর তাদের দেখা পাওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না আমার। সেই তুলনায় পানকৌড়িগুলো ছিল নিরীহ।

কাকেদের সঙ্গে লড়াই করে বসবাস করতে হতো ওদের। গলার আওয়াজ পাইনি কখনো। থাকত একা-একা। একই গাছে অনেক পানকৌড়ি হলেও একসঙ্গে দলবেঁধে থাকতে দেখিনি কখনো। কাকেদের সাথে লড়াই করত একা-একা। অধিকাংশ সময় হেরে যেত। খুব মায়া হত আমার।

আর ছিল প্রায় পোষা আমার কাকের দল, গোটা পনেরো। আমার বর বলত প্রতিদিন দুপুরে যখন বাড়ি ফিরতাম, মোড়ের মাথায় অটো থেকে নামলেই নাকি কাকগুলো বারান্দায় সমস্বরে চিৎকার করে আমার আসার খবর ওকে জানিয়ে দিত। ওদের বরাদ্দ খাবার আমি দিতাম রান্নাঘরের জানালায়। নিরামিষ

বাবুদের পছন্দ হত না, আগের দিনের মাছ-কাঁটা রেখে দিতে হত। নইলে তাদের সমস্বর প্রতিবাদে পাড়া কাঁপত। যেদিন চিংড়ি মাছ হত তাদের আনন্দ দ্যাখে কে! তবে কাঁচা কিছু খাবেন না তাঁরা, খাবেন আমার রান্না। সক্কালবেলা এসে হাত থেকে রুটি, বিস্কুট খেয়ে যেত। ফ্ল্যাটের উত্তরে সুপুরি গাছে এক কাকদম্পতি প্রতিবছর বাসা করতো পরম যত্নে। নতুন ফ্ল্যাট ওঠার হিড়িকে সেই সুপারি গাছ কাটা পড়ল। কাক দম্পতির বাসা হারানোর বেদনায় অসহায় চিৎকারে আমিও বিনিদ্র নিশি যাপন করেছি বেশ কয়েকদিন। তারপর দেখলাম পাশের ফ্ল্যাটের অব্যবহৃত বারান্দায় কাপড় মেলার একটি বেঁকানো শিককে গাছের ডালের মতো ব্যবহার করে ধীরে-ধীরে তারা একটি বাসা তৈরি করল। এটি হল আগের থেকেও বেশি মজবুত। তারা সেখানেই তাদের নতুন ঘরকন্না করতে লাগল। খুব আশ্চর্য হয়েছিলাম দেখে! সারভাইভাল অভ দ্য ফিটেস্ট কথাটা কী ভীষণ সত্যি! মানুষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে না-পারলেও সহাবস্থানের কৌশল শিখে নিতে দেখে আশ্বস্ত হল মন। সেই বাসাটি পরবর্তীতে এতই পাকাপোক্ত হয়ে উঠল যে মাঝেমাঝেই অন্য গাছের কাকেরা দখল নিতে চলে আসত, মাঝে-মাঝে পায়রার দলও লোভ সামলাতে পারত না। তখন ওই কাক দম্পতি তাদের বাসা রক্ষার্থে কী প্রচণ্ড বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ত সেটা ছিল দেখার মতন বিষয়।

আর ছিল পায়রা প্রত্যেকদিন এসে কাকেদের সঙ্গে লড়াই করে খেত ওরা। কাক যে পায়রাকে ভয় পায় তা আগে জানা ছিল না। তাই পরে ওদের দিতাম নীচের তলার জানালার সানসেটে।

জানতাম কাক নাকি ঝাড়ুদার পাখি, অভিজ্ঞতায় দেখলাম সেটা পায়রা। কাকেরা খেত না অনেক কিছুই, পায়রাগুলো এসে সব সাফ করে যেত। ব্যালকনির ভেতর আলাদা করে চড়াইগুলোর জন্য রাখা থাকত চাল আর একটা বাটিতে করে জল। ওরা ওদের মতো ঢুকে এসে চুপচাপ খেয়ে যেত আর মাঝে-মাঝে আমার ঘরে টুকটুক করে হেঁটে বেড়াত। তবে কাছাকাছি কাউকে দেখলেই ফুরুত করে উড়ে পালাত। ওদের স্বাধীন গতিবিধি বরাবরই আকর্ষণ করে আমায়। তবে অনেকবার ওদের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করেছি আমি। বাটি ভরে জল দিয়েছি, খাবার দিয়েছি, দূর থেকে বসে-বসে দেখেছি ওরা সেই বাটি থেকে খাবার খেয়েছে, জল খেয়েছে, জলে স্নান করেছে। কিন্তু কাছে যেতে গেলেই উড়ে পালিয়েছে। ওদের বোধহয় স্বাচ্ছন্দ্যের থেকে স্বাধীনতা বেশি প্রিয়। এ বাড়িতেও খাবার-জল দিয়ে রাখি, আসে যায়, বেশির ভাগই চড়াই। এখানে গ্রাউন্ড ফ্লোর।

ছোটো থেকেই পাড়া-বেপাড়ার নেড়ি-দের সকলের প্রিয় আমি, বরাবর। আমায় দেখলেই তারা লেজ নেড়ে-নেড়ে এগিয়ে আসে। আমিও প্রবল আবেগে সব সামাজিক বাধা তুচ্ছজ্ঞান করে তাদের গায়ে-মাথায় গভীর ভালবাসায় হাত বুলিয়ে দিই। অধিকাংশ সময়ই আমার সঙ্গে যিনি আছেন অথবা আশপাশের অপরিচিতরা ভয়ে অথবা ঘৃণায় আমার থেকে সামাজিক দূরত্ব তৈরি করে নেয়। বর্তমানে অবশ্য সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার কর্তব্য হেতু বিষয়টি আমার পক্ষে বোধহয় আগের থেকে সহজই হবে।

এখন আবার জুটেছে এক 'মাওও'। যে এক সত্যি-সত্যি কথা বলা বেড়াল! যখন রান্না করি সে এসে জানালার বাইরে

বসে কত রকম করে কথা বলে—বলে বোঝান যাবে না, শুনলেই বিশ্বাস হবে। খাওয়ার বদলে আদরের দিকে তার আগ্রহ বেশি। সকাল-বিকেল বাইরে বেরোলেই কোথা থেকে ছুটে এসে পায়ের কাছে গড়াগড়ি খায়। যদি একটু গায়ে হাত বুলিয়ে দিই তাহলে সে একেবারে আহ্লাদে আটখানা। তার সাথে ফ্ল্যাটের পেছনে উঠোনের মত জায়গাটায় এখন কাটে অনেকটা সময়, দিনে রাতে। আমার সুন্দরী 'মাওও' খুবই স্বাস্থ্য সচেতন। সে কার্বোহাইড্রেট ছোঁয় না, প্রোটিন নির্ভর ডায়েট তার। মাছ দিয়ে ভাত মেখে দিলে বেছে-বেছে মাছটুকু খেয়ে যায়। মাছের কাঁটাও মুখে খুব একটা রোচে না। দুধ দিয়ে রুটি দিলে দুধটুকু খায়, রুটি

পড়ে থাকে। বিস্কুট মাঝে মাঝে। তবুও তার খাবার অভাব হয় না, 'কথা বলা'র গুণে পেয়ে যায় ইচ্ছামতন খাবার, গোটাকতক বাঁধাবাড়ির দৌলতে।

লকডাউনের এই সময়টা এদের নিয়ে আমি বেশ আছি। এই দু-মাসের লকডাউন সময়ের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে যেতে হয়েছে দু-একবার। অধিকাংশ কাজটাই মুঠোফোনের দৌলতে বাড়ি বসে করে ফেলা যাচ্ছে। যে দু-একদিন বেরিয়েছি সে ক-দিন বেশ ভয় লেগেছে আমার। সবার মুখে মাস্ক। সবার চাহনিতে ভয়। কাছাকাছি এসে গেলে আতঙ্ক! ফাঁকা শুনশান রাস্তায় মাস্ক-পড়া কেউ আসছে দেখলে তাকে এলিয়েন-এলিয়েন মনে হচ্ছিল। আবার কখনও ইংরেজি 'ভাইরাস আউটব্রেক মুভি'-তে অভিনয় করা চরিত্রের মতো লাগছিলো নিজেকে। ভাইরাস ঘটিত আক্রমণে গোটা শহরের কোয়ারেন্টাইন লকডাউন, এর আগে দেখেছি একমাত্র ইংরেজি সিনেমাতেই। তাই বাড়ির বাইরের বর্তমান পরিস্থিতিটা আরও কেমন ভয়াবহ মনে হয় সেইসব সিনেমার অন্তিম দৃশ্যগুলি কল্পনা করে।

তাই বাইরে না-বেরিয়ে বাড়ির মধ্যে বেশ ভালো আছি আমি—পাখি, বিড়াল, নিজের হাতে তৈরি করা ছোট ছোট টবের বাহারি গাছেদের নিয়ে ভালো আছি। আর আগের থেকে একটু বেশি স্বাধীনতা উপভোগ করছি। ঘড়ির চোখ-রাঙানি নেই, সময় চলছে আমার নিজের নিয়মে। সময়ের বাধা অতিক্রম করে আমার মনের জানলা দিয়ে গানের সুরে দুই ডানা মেলে মনে মনে পাড়ি দিচ্ছি অসীম অনন্তে... কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা...

হ্যাঁ ভালোই আছি আমি। দেশ-কাল পরিস্থিতি, এই গোটা পৃথিবীর সব খবরকে যতটা সম্ভব নিজের কাছে পৌঁছতে না-দিয়ে শুধু নিজের ছোট্ট গণ্ডিতে নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখে বাইরে কোনোদিকে না-তাকিয়ে স্বার্থপরের মতো ভালো থাকার চেষ্টা করছি আমি। লকডাউনের মধ্যে সব হিসেব উলটে-পালটে গেছে গোটা পৃথিবীর। মানুষের প্রতিটি গতিবিধি পৃথিবীকে প্রত্যেকদিন আরও আরও বেশি অসুস্থ করে চলেছে। লকডাউনের ফল-স্বরূপ মনুষ্য দ্বারা সৃষ্ট প্রাকৃতিক দূষণ অনেক কমেছে, পৃথিবী সুস্থ হয়ে উঠছে ধীরে-ধীরে—ভালোই লাগছিল এসব ভাবতে।

তার সঙ্গে চিন্তায় ছিলাম যেসব প্রাণীগুলি একান্তভাবেই মানুষের উপর নির্ভরশীল তাদের কথা ভেবে। কিন্তু কতটুকুই বা ক্ষমতা আমার। কষ্ট হলেও প্রায় কিছুই করার নেই আমার ওদের জন্য। তার উপর আবার এলো ঘূর্ণিঝড় উম্ফুন। কত পাখির ডানা ভাঙল, কত পাখি বাসা হারাল, হারাল তাদের সন্তান-সন্ততিকে। কত গাছ উপড়ে গেল, কেই-বা তার হিসেব জানে! কত ঘর জলে ভেসে গেল, কত মানুষ নিঃস্ব হল তার খবরও ঠিকঠাক জানা নেই। পরিযায়ী শ্রমিকদের কথা না-হয় বাদই দিলাম। আমার বাড়ির কাজের দিদির মার্চ মাসের চব্বিশ তারিখের পর থেকে আর কোনো খবর পাইনি। সে আসত ট্রেনে চেপে জেলার দূর এক প্রান্ত থেকে। ফোন নাম্বারও নেই যে যোগাযোগ করতে পারি। বড়ো দুশ্চিন্তায় ছিলাম ওকে নিয়ে। মে মাস শেষের দু-দিন আগে হঠাৎ এসে উদয় হল বাড়ির দরজায়। বলল ওরা চারজন

মিলে একটা মাল-বওয়া গাড়ি ভাড়া করে বহুকষ্টে এসেছে। মুখে কিছু না-বললেও বুঝতে পারলাম এসেছে টাকার প্রয়োজনে, আর কাজটা এখনও টিকে আছে কিনা সেটা জানার আশায়। ঝড়ে গাছ উপড়ে তার বাড়ির চালের উপর পড়েছে। একে ঘরে খাওয়ার জোগাড় নেই তার ওপর ঝড়ের উপদ্রব।

ভালো লাগেনা এসব ভাবতে আর। নিজের অসহায় সীমাবদ্ধতাকে মেনে নেওয়া ছাড়া কী-বা করার আছে আমার! বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিতে শিখে গিয়েছি, আর তার সঙ্গে শিখেছি সব চিন্তা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার কৌশল। নিজেকে বেশ সৌভাগ্যের অধিকারী মনে হয়। সৌভাগ্য যে এত বেদনাদায়ক তা বরাবর অনুভব করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমি। কী ভীষণ সীমাবদ্ধ আর গণ্ডিবদ্ধ আমাদের জীবন। অসহায় ভাবে দেখে চলে ছাড়া প্রায় কিছুই আর করার নেই। তাই ঘরের আঙিনা থেকে আকাশ দেখি আমি। কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা...

তিয়াসা প্রামাণিক
দমদম

আমাদের উলটোদিকের বাড়িটির মালিকানা হস্তান্তরিত হওয়ার পর যাঁরা এলেন তাঁদের সাদা ফুটফুটে, লোমশ একটি বিলাতি সারমেয় ছিল। সে যখন তাদের বাড়ির প্রবেশ দরজার সামনে এসে দাঁড়াত, আমাদের পাড়ার শুদ্ধ দেশীয়, স্থায়ী বাসিন্দা সারমেয়দল প্রবল চিৎকার ও মুখবিকৃতি করে তাকে টিটকারি দিত। গ্রিলের দরজার ভেতর থেকে সেই বিলাতি সারমেয়টি কিছুক্ষণ অবজ্ঞার দৃষ্টি হেনে বা বিরক্তিসূচক কণ্ঠে তাদের দু-

একটি প্রত্যুত্তর দিয়ে ধীরপদে ঘরে ঢুকে যেত। ভাবখানা এই যে এইসব জাতকুলমানহীনদের সঙ্গে কী কথা বলব! দু-তিন বছর পর সেই সারমেয়টি বয়সজনোচিত কারণে সাধনোচিত ধামে গমন করলে তার স্থান নিল একটি রোগা প্যাংলা খাঁটি নেড়ি। সে এখন যত্নআত্তি পেয়ে বেশ নাদুসনুদুসটি হয়ে উঠেছে। গলায় বকলেস-টকলেস দিয়ে তাকে বেশ সাজিয়ে রাখাও হয়। কিন্তু সমস্যা তার স্বগোত্রীয়রা যখন কোনো কারণে চিৎকার জোড়ে সে-ও তখন স্বজাতি প্রীতিতে দরজার বাইরে প্রাণপণে বেড়িয়ে আসার চেষ্টা করে ঘোষণা করতে চায় আমি তোমাদেরই লোক, থুড়ি স্বজন। তবে তার স্বগোত্রীয়রা তাকে করুণা আর

হিংসামিশ্রিত নজরে দেখে ভাবে—বেশ তো খাচ্ছিস-দাচ্ছিস ল্যাজ নাড়াচ্ছিস, বাইরের জগতটাকে আর বুঝবি কী!

আমি এখন এই দুই সারমেয় জীবনের মধ্যবর্তীতে অবস্থান করছি। লকডাউনের বাজারে ঘর থেকে রাস্তায় বেরোনো মানুষজনের সাথে স্বভাবোচিত উন্নাসিকতা ও স্পর্শভীতিতে না-পারি ঠিকঠাক মিশতে আর তারাও ভাবে বেশ তো ইস্কুল না-গিয়ে সরকারের পয়সায় বসে বসে গিলছো, কী বুঝবে জীবনসংগ্রাম কাকে বলে।

সদর শহর কৃষ্ণনগরের মতো একটি প্রাচীন জনপদে আমার বাস। কর্মসূত্রে বাড়ি থেকে পঁচাশি কিলোমিটার দূরে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী একটি আধা-শহরে পড়াতে যেতে হয়। আধা-শহর বলছি এই কারণে যে পঞ্চায়েতের অধীনে হয়েও শহুরে জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য এখানে সহজলভ্য। করোনা যখন ভারতবর্ষে একের পর এক রাজ্যে জয়ডঙ্কা বাজাচ্ছে, এমনকি লন্ডনপ্রবাসী যুবকের হাত ধরে পশ্চিমবঙ্গেও তার তরবারি ধীরে-ধীরে কোষমুক্ত করছে,তখনও আমরা একাদশ দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার ছাত্রছাত্রীদের প্রহরারত। না, তখনও মুখে মুখোশ ওঠেনি। যদিও হাত বারবার সাবান দিয়ে ধোওয়া বা ব্যাগে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহারের অভ্যাস আমার চিরকালের, যা 'বাতিক' বলে এতকাল গণ্য হয়ে এসেছে। জামাকাপড় বাইরে থেকে এসে ধুয়ে দেওয়া—এ নিয়েও যারা নেতাধোপানির ঘাটের কাজটি আমাকে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন; তারা এবার বোঝো!!! দেখো দেখো দেখে শেখো। উফফ নিজেকে 'লেডি রামমোহন' লাগছে। 'পাইওনিয়র অভ দ্য হাইজিনিক সেন্স'।

১৪ মার্চ শেষ স্কুল গেছি একাদশ শ্রেণির পরীক্ষার নজরদারি করতে। এরপর শিক্ষাদপ্তরের বিভিন্ন নির্দেশ মেনে আমার স্কুলে যাবার নির্ধারিত দিন ছিল ২৫ মার্চ, কিন্তু ২৩ মার্চ উচ্চমাধ্যমিক ও একাদশ শ্রেণির পরীক্ষা স্থগিত ঘোষিত হওয়ায় খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পেলাম।

এবার শুরু হল লকডাউন। ব্যাপারটা কী বুঝতে বুঝতেই কেটে গেল কয়েকটা দিন। জনতা কারফিউয়ের দিন থেকেই বাড়ির দুই পরিচারিকার সবেতন ছুটি। সুতরাং লেগে পড়লাম সুগৃহিণী হবার কাজে। সক্কাল সক্কাল উঠে কিছু নিজস্ব কাজ সেরে লেগে পড়ি রান্নায়। রান্না সেরে ঘরদোর মুছে, বাসন মেজে সাড়ে

তিনটে চারটে করে ফেলি দুপুরের খাবার খেতে। ওদিকে গৃহস্বামী মার্চ মাস ইয়ার-এন্ডিং বলে নাকের সামনে ল্যাপটপ খুলে, কানে ফোন দিয়ে রাতদিন এক করে 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' করেন। প্রথম প্রথম সব কাজ একা হাতে সামাল দিতে বেশ আত্মশ্লাঘা অনুভব করছিলাম। আয়-আয় দেখে যা কেমন দশভুজা আমি। কিন্তু ক-দিন পর থেকেই শরীর,মন দুটোই উঠল হাঁফিয়ে। চড়তে লাগল মাথা। গৃহস্বামীটি সোশ্যাল মিডিয়ায় বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেন,নানাধরণের ছবি পোস্ট করেন, মাঝে মাঝে অফিসে ঢুঁ মারেন আর ওয়ার্ক ফ্রম হোম করেন। আর আমি বেচারি ঘেমে নেয়ে জবজবে হয়ে ঘরদোর সামলাচ্ছি—এ তো চলতে পারে না। আমার নারীমুক্তির উন্মেষ ঘটল। আমি কাজ করে মরব আর তুমি 'আহা তোমার কি খাটনি' শুধু এই বলে দায় সারবে! এ-তো চলতে পরে না বাপু। দিলাম ধরিয়ে হাতে জলের বালতি আর ঘর মোছার ব্রাশ। প্রথম ক-দিন একটু অসুবিধা হল। এখন দিনকে দিন এক্সপার্ট হয়ে উঠছে। আমারও একটু রিলিফ। এখন ঘর-ঝাঁট আমার, মোছা তাঁর। একেবারে বিসমিল্লা আর আল্লারাখার যুগলবন্দি।

কাজ সেরে ফোনের সোশ্যাল মিডিয়া খুলে বসি। লকডাউনের প্রথম কদিন ফেসবুক খুললেই করোনা কবিতা, করোনা গান, করোনা নিয়ে নতুন নতুন তথ্য। তারপর শুরু হল 'চ্যালেঞ্জ নিবি না শালা' পর্ব। ছোটোবেলা-মাঝারিবেলা-বড়বেলা-শাড়ি পরা হাত-পা-কোন ছবি বাদ নেই। এই করতে করতে চলে এল বৈশাখ। বাঙালির নতুন বছরের প্রথম দিনটিতে আমাদের ছিয়াত্তর বছরের প্রতিষ্ঠান শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগারের প্রভাতী অনুষ্ঠানে এই

প্রথম ছেদ পড়ায় মনটা খুব খারাপ লাগছিল। তবু প্রযুক্তির দৌলতে সন্ধেবেলা মোবাইল ল্যাপটপের দৌলতে গান-কবিতা-গল্পে একে অন্যকে ছুঁয়ে থাকলাম। এরপরই বাঙালির রবি পরব, পঁচিশে বৈশাখ। এমনিতেই গান-কবিতা-আঁকা-নাটক-সিনেমা সব ব্যপারেই বাঙালির দারুণ ফান্ডা। আর বিষয় যদি রবিঠাকুর হন তাহলে তো কথাই নেই। সারা ফেসবুক জুড়ে বাড়ির গিন্নি-কর্তা-ছেলে-মেয়ে-কাকু-কাকিমা-ঠাকুরদা-ঠাকুরমা হয় গাইছে, নয় নাচছে, নয় কবিতা বলছে। যাঁরা শিল্পোজীবী তাঁদের কথা তো ছেড়েই দিন। প্রতিদিন নব নব রূপে এসে জানান দেন 'আমি আছি'। সকলেরই স্বভাবের গভীরে লুকিয়ে থাকা অসাধারণত্বের আশ্রয়স্থল ফেসবুক। মাঝেমধ্যে এই অধমও আশ্রয় খুঁজি ওই 'বুকে'। আরে ভাই আফটার অল বাঙালি তো!!

ইতিমধ্যে আমিও শুরু করেছি ওয়ার্ক ফ্রম হোম। অনলাইনে ক্লাস নিই। ওদের পড়াতে, প্রশ্নের উত্তর দিতে চলে যায় অনেক সময়। কেউ-কেউ আবার উত্তর লিখে হোয়াটস-অ্যাপে পাঠিয়ে দেয়, সেগুলোও সংশোধন করে দিই। শুধু তো ছাত্রীর প্রশ্ন নয়,

তার অভিভাবক, গৃহশিক্ষক সকলের অনন্ত জিজ্ঞাসা। 'কুমোর পাড়ার গরুর গাড়ি' খুব জোর মেরে কেটে 'মাগো আমায় ছুটি দিতে বল'-এর পাঁচলাইন পর্যন্ত যে-মেয়ের রবি ঠাকুরের দৌড় সে-ও কিনা 'গোরা' উপন্যাস থেকে এমন-এমন প্রশ্ন করে যা শুনলে পিলে চমকে যায়। বুঝতেই পারি অলক্ষে থাকা মেঘনাদটি কে। কারণ বেশিরভাগ গৃহশিক্ষকের কাছে স্কুলশিক্ষকরা গণশত্রু। বাবা-কাকা-মামার দাক্ষিণ্যে চাকরি পাওয়া জীব। আমিও তেমনি, বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সূচাগ্র্য মেদিনী। দে না কত দিবি বাউন্সার, বডিলাইন বল! লড়ে যাব। তবে এই সুযোগে 'পল্লবগ্রাহী আমি-র' বেশ জ্ঞানের সঞ্চার হচ্ছে। কে জানে বাপু আবার বোধিজ্ঞান লাভ করে বুদ্ধদেবের মহিলা সংস্করণ হয়ে যাব কিনা!! নিজের নব নব গুণে নিজেই মোহিত। নার্সিসাস আর কি!

তবে একটা বিষয় কদিন ধরেই ভাবছি। লক্ষ্মীর পাঁচালিতে পড়েছিলাম নারীরা রান্না করা, ঘর ঝাঁট দেওয়া এইসব কাজ আজকাল ছেড়ে দিয়েছে বলেই ঘরে ঘরে এত অলক্ষ্মীর দৌরাত্ম্য। তা সেই বাইশে মার্চ থেকে এর সবগুলোই তো নিজের হাতে সামলাচ্ছি,এবার আমার 'অলক্ষ্মী'বদনাম নিশ্চয়ই ঘুচবে।

পিয়ালী রায়
কৃষ্ণনগর

সময়টা মার্চের মাঝামাঝি, তখনো ঘুরছি-ফিরছি, অফিস করছি, প্রয়োজনীয় কাজকর্ম আর আমার সবচেয়ে প্রিয় কাজ যেটা, অবসর পেলেই ফুরুত করে ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে পড়া, সবই চলছে রোজকার নিয়ম মেনে। হাওয়ায় ভাসছে চীনে করোনা নামক কী এক জীবাণুঘটিত অসুখ ছড়িয়েছে তা-তে নাকি বেশ কিছু মানুষ আক্রান্ত, কিছু মানুষ মারাও গেছেন, সেই সব খবর। আমাদের জীবন চলছে গতানুগতিক নিয়ম মেনেই। হঠাৎ

একদিনের নোটিশে কার্ফু জারি। খুব ছোটোবেলায় একবার কার্ফু শুনেছিলাম সম্ভবত রামমন্দির-বাবরি মসজিদ কাণ্ডের সময়। আবার কার্ফু? কারণ করোনা নাকি ভারতীয়দের ওপরও থাবা বসিয়েছে। পরের দিন থেকে লক ডাউন, দোকান পাট বন্ধ, মানুষ গৃহবন্দি। যেটুকু দোকান পাট খুলছে তার মধ্যেই—

পড়ি গেল কাড়াকাড়ি,
আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান
তারি লাগি তাড়াতাড়ি”

বস্তা-বস্তা চাল, ডাল, আটা, আলু, নিমেষে উধাও। আর যদি পাওয়া না-যায়, খাদ্যরসিক বাঙালি পুঙ্গব কি অনাহারে

জীবন দান করবে? তা তো হতে পারে না। করোনা অনিশ্চিত তখনো, কিন্তু অনাহারে মরার আতঙ্ক তখন মাথার শিয়রে। শুরু হল লকডাউন, পাশাপাশি বুকের মধ্যে অজানা কম্পন।

খবরের কাগজে খবর পাচ্ছি চীনেই নাকি জন্মগ্রহণ করেছে কোভিড ১৯ নামক এই জীবানু। জন্মেই তাণ্ডব শুরু করেছে, হাজার-হাজার লোক মারা গেছে, শুধু চীন নয়, ইটালি স্পেন,আমেরিকা। সে কি আমেরিকায় ঢুকে পড়েছে? সর্বনাশ, ওরা তো হেড-মাষ্টারমশাই। গোটা পৃথিবীর মাথা। সেই হেড-মাষ্টারমশাই ট্রাম্পসাহেবও তখন হম্বিতম্বি করছেন। হেড-অফিসের বড়োবাবুর মতো চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠছেন? তাহলে তো আমরা চুনোপুঁটি। আমরা কি বাঁচব? আমরা আরামপ্রিয় বাঙালি তখনো ভাবছি কোথায় চীন, কোথায় আমেরিকা, অনেক দূরে, সেখান থেকে গুটিগুটি পায়ে জীবাণু এখানে আসতে বহুযুগ পেরিয়ে যাবে। ততদিনে কব্জি ডুবিয়ে খেয়ে আর নাকে তৈল মর্দন করে ভালো করে ঘুমিয়েতো নিই। রাষ্ট্রকর্তাদের কড়া নির্দেশ, বাড়ি থেকে একদম বেরোনো যাবে না। তাই পুরোপুরি ছুটির আমেজে দিনযাপন। বাড়িতে রোজ পিকনিক। তা না হয় হল, বেশ আরামেই দিন কাটছিল। কিন্তু যে-ছুটির জন্যে অফিসে চিল-চিৎকার, বসের সঙ্গে মনোমালিন্য, টেবিল চাপড়ে নিজের কাজের ফিরিস্তি দেওয়া, বিনিময়ে ছুটি না-পাওয়া, বসকে মৃদু ভড়কানি দেবার জন্যে চাকরিতে রিজাইন দেবার হুমকি দেওয়া, সে-ছুটিও একদিন বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল। নিরন্তর কোনো কিছুই ভালো লাগে না, একটা সময় একঘেয়েমি আসবেই, নতুন জামাকাপড় থেকে দুষ্টুমিষ্টি প্রেমিক-

প্রেমিকা, উত্তাল প্রেম, জিভে-জল-আনা বিরিয়ানি, ফুচকা সবেতেই। সবকিছু রোজ পেতে-পেতেই হোক আর খেতে-খেতেই হোক, একঘেয়েমি আর অরুচি আসতে বাধ্য। আম-জনতার দ্বিতীয় দফার লকডাউন থেকেই ব্যাজার মুখ আর অরুচি।

পরবর্তী অধ্যায় একটু শ্রুতিকটু লাগবে হয়তো। এতদিন সকাল হতেই ম্যাডামজি রান্নাঘরে, স্যার বেরোবেন রান্নাবান্না, টিফিন গোছানো, বাচ্চারা স্কুলে যাবে তাদের রেডি করা। ভীষণ ব্যস্ততা। আর স্যার ঘুম থেকে উঠেই চায়ের কাপ হাতে কোনো রকমে দায়সারা ভাবে দেশের খবরের পাতায় চোখ বুলিয়ে,

গালে ফেনা মেখে, তারপর স্নান করে পোর্টফলিও গুছিয়ে ধাঁ।

ব্যাস উভয় পক্ষই নিশ্চিন্ত। ম্যাডাম মুখে ফেসপ্যাক লাগিয়ে ফেসবুক নিয়ে বসবেন, টুকটাক চিটচ্যাট। আর স্যার, সারাদিনের জন্যে গালফোলা বিজি বস, পেল্লাই গাড়ি, পেল্লাই অফিস। রাত হলে গম্ভীর মুখে একরাশ বিরক্তি ব্যাগে পুরে বাড়ি ফেরা, সোফায় শরীর এলিয়ে দিয়ে এককাপ চা বা সোনালি পানীয়। এরপর কোনো রকমে ডিনার সেরে বাথরুম টু বেডরুম। বাচ্চারা নির্বাসিত নিজেদের ঘরে। কারো সঙ্গে কারো বাক্যালাপ নেই, স্নেহের পরশ নেই। তথাকথিত সেই সুপার-বিজি কাপলদের যদি ২৪ ঘণ্টা একছাদের নীচে, দিনের-পর-দিন কাটাতে হয়, প্রথমে একটু উত্তাপ, তারপর হালকা ধুম্র-উদগিরণ, তারপর সুপ্ত আগ্নেয়গিরি থেকে ভয়ংকর লাভা উদগিরণ। ছানা-পোনাগুলোর গায়ে জলন্ত লাভার টুকরো ছিটকে-ছিটকে লাগে, আর তারা চমকে-চমকে ওঠে। ঘরের দরজা বন্ধ করে চুপটি করে বসে থাকে, আতঙ্কের রাত কাটায়। আসলে বাইরে বেরোলে মনে অক্সিজেন প্রবেশ করে। তাই দাঁত নখগুলো গুটিয়ে রেখে পরিশীলিত পরিমার্জিত সুখী-সুখী ভাবমূর্তিটা সমাজের কাছে তুলে ধরা যায়, মেকি হলেও এলিট ক্যাটিগরিতে ঢুকে পড়া যায় সহজেই।

যাই হোক লকডাউন চলছে, তৃতীয় দফায়, তার মধ্যে অবাঞ্ছিত, অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে এসে গেল আমফান। গোদের ওপর বিষফোঁড়া।

আসছি আত্মপরিচয় প্রদান পর্বে। আমি পেশায় একজন পুলিশ কর্মী। কলকাতা পুলিশের গোয়ান্দা বিভাগের অফিসার।

আমার কাজ মূলত শিশুদের নিয়ে। একদিকে শিশু অপরাধী, অন্যদিকে শিশু যখন অপরাধের শিকার সেই সব শিশুদের নিয়ে। ২০১০-এ ভারতীয় সংবিধানে যুক্ত হয় শিশু সুরক্ষা আইন। ২০১২, Protection of Child from Sexual Offences (POCSO ACT) পাশাপাশি শিশুশ্রমিক (Child Labour Act) বাল্যবিবাহ, (Child Marriage Act) শিশু পাচার (Child Trafficking Act)—সবই আছে। লকডাউনে কিন্তু অপরাধ থেমে থাকেনি। কেউ করে অভাবে আর কেউ করে স্বভাবে। অপরাধ এদের জৈবিক চাহিদার মতো।

লকডাউনে ইমার্জেন্সি সার্ভিসে যাঁরা আছেন, তাঁদের প্রায় রাতের ঘুম চলে যাবার অবস্থা। দিবারাত্র পরিশ্রম, এই হসপিটালে রোগী পৌছানো, তাদের দেখভাল, তাদের পরিবার পরিজনরা যে কোয়ারেন্টিন সেন্টারে সেখানে তাদের দেখভাল করা। এই মর্গ তো এই শ্মশান বা কবরস্থানে। আর বিশেষ করে আমরা মেয়েরা, যারা বয়স্ক পিতামাতার একমাত্র সন্তান, কারো মা, তাদের তো ঘরেবাইরে দু-দিক সামলাতে গিয়ে প্রায় নাভিশ্বাস ওঠার অবস্থা। যারা পরিচারিকা ছিলেন তাদের সবেতন ছুটি দিয়ে দিয়েছি। মাসের শেষে তাদের মাস মাইনে আর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসেছি। অতএব রান্নাবান্না, ঘরমোছা, বাসনমাজা থেকে জামাকাপড় কাচা, বাজার-দোকান করা সব একা-হাতেই সামলাতে হচ্ছে। সব সামলে দৈনন্দিন অফিস। অপরাধ থেমে নেই। একই সঙ্গে চলছে তদন্তের কাজ। কলকাতা সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে অসংখ্য হোম আছে। যেখানে উদ্ধার হওয়া বাচ্চাদের রাখা হয়। করোনা আবহে তারা

কেমন আছে, একসঙ্গে অনেক বাচ্চা থাকাটা কি নিরাপদ? তাদের কী-কী সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, হাজার-হাজার শিশু রাস্তায় থাকে, তাদের কিছু দৈনন্দিন খাবার ব্যবস্থা করে কিছু সরকারি কিছু বেসরকারি সংস্থা। সেগুলো তদারক করা, তাদের সঙ্গে থেকে সহযোগিতা করা। এই অবস্থায় WEST BENGAL CHILD RIGHTS COMMISSION কিছু গাইড লাইন দিয়েছেন সেই নির্দেশ মতো কাজ করা।

আজ দিন এসেছে— "আপন হতে বাহির হয়ে সামনে দাঁড়া"। করোনার সঙ্গে লড়াইয়ের একমাত্র হাতিয়ার নিজেকে

সুরক্ষিত রাখা, আর পাশাপাশি সকলকে সুরক্ষিত থাকার পরামর্শ দেওয়া, সুরক্ষিত থাকতে সাহায্য করা। আজ দেখি অনেকে নিজে দামি-দামি মাস্ক পরে ঘুরে বেরাচ্ছে, দামি টুপি, গ্লাভস—সব নিজেদের জন্যে। লিটারও নয় ব্যারেল-ব্যারেল স্যানিটাইজারে ঘর ভর্তি, আগামী চার-পাঁচ মাসের খাদ্য মজুত নিজের ভাঁড়ারে। কিন্তু একটু যদি অন্যের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিই, একদিনের খাবার যদি কারো মুখে তুলে দিতে পারি, ৫০/১০০ মাস্ক কিনে কিছু জনকে বিলি করতে পারি, আজকের দিনে এটাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য হওয়া উচিত। যে আশ্রয়হীন, বুভুক্ষু তার কাছে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, আত্মসুরক্ষা সোনার পাথর বাটির মতো অবাস্তব। তাই আজ আমাদের সবচেয়ে বড়ো দায়িত্ব আগে সকলের অন্নসংস্থান করা তারপর যা কিছু। কলকাতা পুলিশের প্রত্যেকটা থানা এবং ট্রাফিক গার্ড থেকে স্থানীয় মানুষ, যারা ভিক্ষা করে, বা ঠেলা চালিয়ে জীবিকানির্বাহ করে তাদের দু-বেলা খাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা, তাদের সুরক্ষিত রাখা সব দায়িত্ব নেওয়া হয়েছে। বাচ্ছাদের খাবার দেওয়া হচ্ছে চাইল্ড লাইন, আরও অনেক বেসরকারি সংস্থা এবং থানা থেকে।

ভালো থাক সকলে, ভালো থাক শিশুরা।

বিপদ যেন আর পিছু ছাড়ে না, এরই মধ্যে দামামা বাজিয়ে হাজির হলো ঘূর্ণিঝড় আমফান। কত মানুষ গৃহহারা, খাদ্য নেই জল নেই, মাথার ওপর ছাদ নেই, চারিদিকে শুধু হাহাকার আর হাহাকার।

সারি-সারি গাছ উপরে পড়ে আছে। সবেমাত্র বসন্ত গেছে, গাছে-গাছে নতুন পাতা, রং-বেরঙের ফুল। এই সময় যে-

পক্ষীকুলের ঘর বাঁধার সময়, সব গাছে-গাছে বাসা, তা-তে ছানাপানা নিয়ে ভরপুর সংসার ছারখার করে দিয়ে গেছে সব, সব স্বপ্ন ভেঙেচুরে তছনছ করে দিয়ে গেছে প্রলয়ঙ্করী ঝড়।

জন্মসূত্রে মফস্‌সল শহরে বাস, তাই প্রকৃতির মধ্যে বেড়ে ওঠা। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা গড়ে ওঠা। ভালোবাসি ফুল, পাখি, গাছপালা, আপন মনে বয়ে-চলা স্নিগ্ধ শীতল নদী। আর ভালোবাসি শিশু। পাপ-পূণ্য আছে কিনা আমি জানি না, তবে এদের ভালোবেসে আমি পেয়েছি প্রচুর। লকাডাউনে সারাদিন শুধু কাজ কাজ আর ডিউটি, একটু অবসর পেলেই ক্যামেরা

হাতে করে ছাদে। এই পাখিগুলো আমার রুদ্ধশ্বাস জীবনে খোলা জানলা। হাজারও পরিশ্রম, মর্নিং-ডিউটি, নাইট-ডিউটি করে এসে কোনোদিন দুপুরে ঘুমোইনি। এদের অমোঘ টানে চলে গেছি ছাদে। এমন একটা দিন নেই যে আমি কিছু পাইনি। অনেক পেয়েছি, এখন দূষণ মুক্ত প্রকৃতি, জনসমাগম কম, তাই পাখিদেরও অবাধ বিচরণ। যা পেয়েছি দু-হাত ভরে নিয়েছি। এরা বোঝে আমার ভালোবাসা। কাক, চড়ুই, শালিক নিত্য খাবার খেতে আসে আমার রান্নাঘরের জানলায়। বাড়ির অন্য সব জানলায় দেওয়া থাকে জলের পাত্র, ভেজা ছোলা। ওরা যে যার মতো এসে খেয়ে যায়। ছাদে বড়ো গামলায় দেওয়া আছে জল, তাতে ওরা স্নান করে যায় বিকেলে। অফিস-বাড়ি মিলিয়ে গোটা কুড়ি কুকুর আছে, তাদের খেতে দেওয়া। এই লকডাউনে সব হোটেল রেষ্টুরেন্ট বন্ধ। খাবার তো দূরের কথা, একফোঁটা জল অবদি পায় না এই অবলা জীবগুলো। এদের নিয়ে ভাবা, এদের নিয়ে থাকা—ওইটুকুই আমার মুক্ত বাতাস। পাখির ছবি তুলি ভালোবেসে, তার চেয়েও বেশি দেখি ওদের কীর্তিকলাপ। সব সময় ছবি তুলি না। বিভোর হয়ে দেখতে থাকি শুধু। কত হাজার ছবি পড়ে আছে ল্যাপটপে, হার্ড ড্রাইভে। প্রসেস করার সময় পাইনি। পোস্ট করার সময় পাইনি। শুধু ছবি তুলেই গেছি। যা পেয়েছি তাই। আসলে ভালোবাসি। এই ভালোবাসাটা চিরকালীন সত্য। আমফানের দুদিন পরেই ছুটে গেছি আমার প্রিয় রেড-রোডে, রবীন্দ্র-সরোবরে, ওরা কেমন আছে দেখতে। কেউ আছে, কেউ নেই। কোথায় হারিয়ে গেছে কেউ জানে না। যারা আছে তাদের অনেকেই ভালো নেই। কেউ বাসাহারা, কেউ

সন্তান হারা। কেউ-বা সঙ্গীহারা। তাদের আর্ত কলরব। পাখিদের জীবন ক্ষণস্থায়ী। তারা জন্মায়, বাঁচে বড়জোর দু-তিন বছর, তারপর চলে যায়। পরিযায়ী পাখিরা আসে ঘর বাঁধে আবার আত্মজকে নিয়ে উড়ে যায়। শুধু রেখে যায় কিছু স্মৃতি কিছু কূজন।

কলকাতা শহরের সব ফ্লাইওভারের নীচে ছানাপোনা নিয়ে সংসার পেতেছে কিছু দুস্থ মানুষ, কিছু-বা ফুটপাতে। তারা কেমন আছে ঝড়ের পরে? সংসার কিঞ্চিৎ লন্ডভণ্ড হলেও প্রাণে বেঁচে গেছে সবাই। ছানাপোনারা নিরাপদে আছে।

এই শিশু, এই ফুল, পাখি সব সুন্দর, কত সহজ সরল। না-আছে শঠতা, না-হিংসা, না-প্রবঞ্চনা, এরা সত্যি তাই এত সুন্দর। বাহ্যিক সৌন্দর্যের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান আত্মিক সৌন্দর্য। যে মন যে আত্মা জলের মতো স্বচ্ছ, উদার, পরের দুঃখে কাতর

সেই সুন্দর। সেই চিরসত্য, সেই চিরস্থায়ী। আমরা আজ আছি, কাল নেই। কিন্তু জগৎ সংসার কি আমাদের মনে রাখবে? কোনো চিহ্ন কি রেখে যেতে পারব? হ্যাঁ মানুষের মনের কোনে একটু হলেও জায়গা থাকবে, আমাদের আত্মা এইভাবেই অমরত্ব লাভ করবে।

একের পর এক মহামারি দুর্যোগ সব কিছুর পরেও যখন প্রকৃতিতে প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হয়, তখন সত্যিই আবার নতুন করে বাঁচতে ইচ্ছে করে,আরও আরও ভালোবাসতে ইচ্ছে করে নিজেকে উজাড় করে দিতে ইচ্ছে করে। চলো আবার নতুন করে শুরু করি—

"এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে— প্রাণ হয়ে আছে ভোর।"

মেঘনা বসুমল্লিক
পিকনিক গার্ডেন, কলকাতা

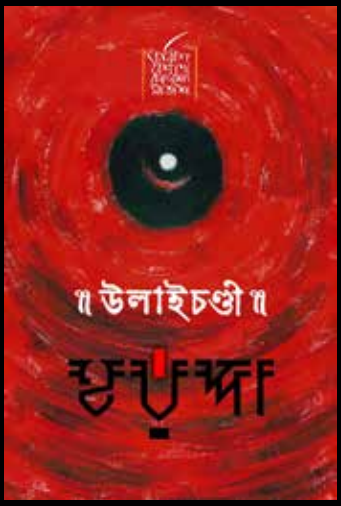

ছড়ানো

পুস্তিকা সংগ্রহ

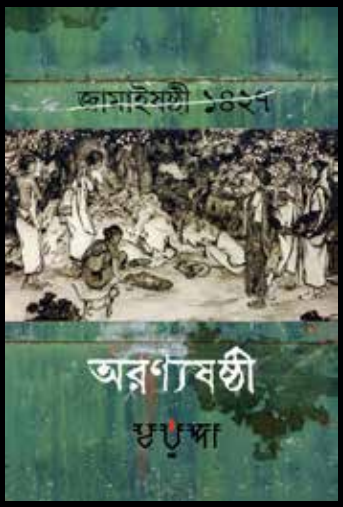

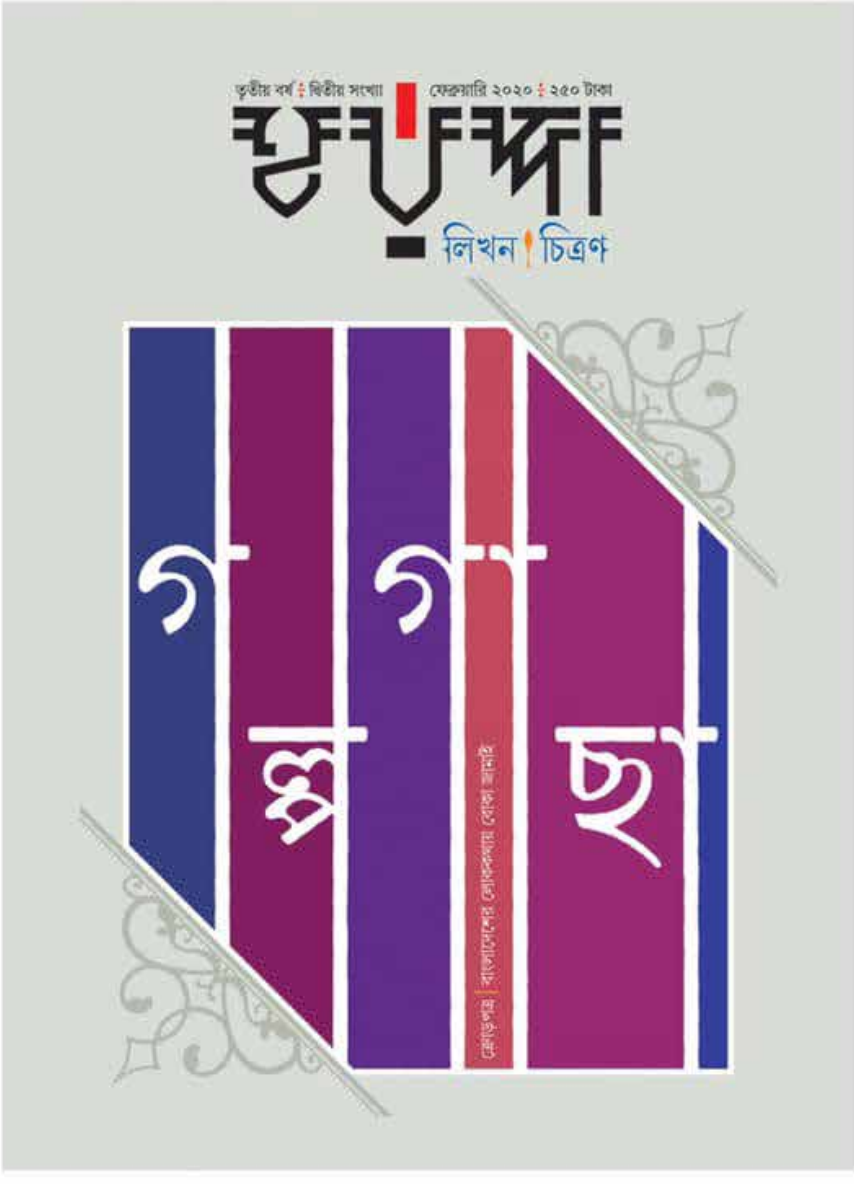

প্র ∙ কা ∙ শি ∙ ত